খরস্রোতা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

.জাগাই না। রাগ হইল খুড়ী পিসিমার উপর। তাহাদের গ্রামের বুড়া কবিরাজের কাছে খুব ভাল ভাল ঔষধ নিশ্চয়ই আছে, খাইলে হাব সারিয়াও উঠে, অথচ পিসিমা তাহাকে ডাকে না কেন? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—গোবর্দ্ধনদের বাড়ীতে সেদিন সে খিয়াছে, বুড়াকে ডাকিলে পয়সা দিতে হয়। এবং তাহার পিসিমা দিন একটা গামছা কিনিয়া বগলা তাঁতীকে পয়সা দিতে পারে নাই, হাও সে জানে। বোধহয় সেইজন্যই সে ডাকে না।···সুমুখে সারি-রি তিনটি শিবের মন্দির। বহুদিনের পুরাণো। ফাটলে অশ্বত্থ গজা শশীশেখব দেওয়ালের কাছে সরিয়া গিয়া মন্দির চার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিল আসিচ্ছা, এমন হয় না! সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়ী ফিরিতেছে, চারিদিক মুছিয়া যে হঠাৎ ওই নিকুঞ্জদের পোড়ো বাড়ীটার কাছে বাবা ধারা াহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।—এয়া লম্বা লম্বা জটা, পরণে বাঘছাল হাতে ত্রিশূল! বলিল, "কি চাই?" আমি বলিলাম, 'মায়ের ওষুধ।' বাস, যেই বলা আব অমনি শিব তাহার ঝুলি হইতে একমুঠা ছাই বাহির করিয়া বলিল, 'নে ধর! মাকে তোর খাইয়ে দিগে যা, এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে।'

এমন সময়ে অদূরে পিসিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—'ওরে ও, কে যাচ্ছিস্ বাছা? আমাদের ছেলেটা যদি ওদিক্ পানে কোথাও······'

'যাচ্ছি পিসিমা' বলিয়া শশীশেখর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কবিরাজের দা হইতে নামিয়া ছুটিয়া একদৌড়ে পিসিমার কাছে গিয়া বলিল, আমায় ডাকছিলে পিসিমা?'

পিসিমা রাগিয়া উঠিল। বলিল. 'না, তোকে ডাক্‌ব কেন? ডা ছিলাম—তাঁতীদের হরেকেষ্টকে।'

বলিয়াই কিয়ৎক্ষণ থামিয়া চলিতে চলিতে সে আবার আরম্ভ কি র 'কি ছেলেই না হয়েছিস্ বাবা! চব্বিশঘণ্টা খেলা আর খেলা! ওদিকে যে মায়ের অসুখ, শিয়রের কাছে বসে থাক্‌লেও ত' কাজ হয়।— বোস্‌গে যা! আমি জল আন্‌তে চল্‌লাম। বুড়োই হই আর অথর্ব্ব হই—পিণ্ডি গিল্‌তে যখন হবে……'

বুড়ী অমন কত বলে। সে কথায় শশীশেখর কান দিল না। ছে গিয়া ডাকিল, 'মা!'

কোনও সাড়া না পাইয়া সে আবার ডাকিল, 'মা!'……

কিন্তু এবারেও মাকে তাহার চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শ হার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল. 'কোর, দাদাকে ডেকে আন্‌ব মা? পিসিমা এই সময় বাড়ী নেই।'

তখনও তাহার মা শুধু তাহারই মুখের পানে অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে অথচ সাড়া দেয় না।

শশীশেখর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে অন্যদিন হাত বাড়াইয়া মা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়, আজ কিন্তু তাহার সে রক্তহীন অস্থিচর্ম্মসার হাত দুইটি বিছানার উপর সোজা হইয়া যেমন পড়িয়াছি তেম্‌নি পড়িয়াই রহিল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে অথচ কথা কহি পারে না,—চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, ঘন ঘন নিশ্ব পড়িতেছিল……

শশীশেখর তাড়াতাড়ি আসিয়া ডাকিল, 'পিসিমা! পিসিমা!'

কিন্তু কোথায় পিসিমা!

সে তখন ছোট পিতলের কলসীটি কাঁখে লইয়া পুকুরে জল আনিতে চলিয়া গিয়াছে। বেশীদূর হয়ত' সে তখনও যায় নাই, কিন্তু মাকে ফেলিয়া সে-ই বা তাহার পিছু পিছু ছোটে কেমন করিয়া! শশীশেখর আবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

দিনের আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে কোনও বস্তুই আর ভাল করিয়া দেখা যায় না। মা'র মুখখানিও ক্রমশ অন্ধকারে মিলাইয়া আসিতেছিল। শশীশেখর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখখানি তাহার মা'র মুখের কাছে লইয়া গিয়া ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়া মার চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল। নিঃশ্বাসের বাতাস তাহার মুখে আসিয়া লাগিতেছে। কিন্তু চোখের জল কিছুতেই আর সে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। যত মুছে ততই আবার অশ্রুর ধারা দর্ দর্ করিয়া গড়াইয়া আসে।

মা তাহার চোখ চাহিয়া রহিয়াছে অথচ কথা কয় না কেন?

শশীশেখরের কান্না পাইতেছিল। নিস্তব্ধ গৃহপ্রান্তে মুমূর্ষু মাতার শিয়রে বসিয়া মুখখানি তাহার ধীরে ধীরে নাড়িয়া দিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সে আবার ডাকিল, 'মা!'

সাড়া দিতে গিয়াই বোধকরি মা'র গলার ভিতরটা ঘড়্ঘড়্ করিয়া উঠিল, নিঃশ্বাস যেন আরও জোরে জোরে পড়িতে লাগিল।

একাকী সেই অন্ধকার ঘরে বসিয়াই একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া সেও তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনা দিবার জন্য মা তাহার হাতও তুলিল না, কথাও বলিল না,

পা এবং হাত দুইটা বার-কতক থর্ থর্ করিয়া নাড়িয়া হঠাৎ সে চুপ হইয়া গেল।

গলার আওয়াজটাও যেন থামিয়াছে। নিঃশ্বাসের বাতাসটাও আর যেন পাওয়া যাইতেছিল না।

শশীশেখর ভাবিল, মা বুঝি তাহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ভাল ক ...র ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া অন্ধকারটাকে যেন ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া মা'র মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেই দেখিল,—না, চাহিয়া রহিয়াছে ত!

—'মা! মা!'

পিসি কোথায় দিয়াশালাই রাখিয়া গেছে কে জানে' প্রদীপটা কোথায় আছে তাহাও সে জানে না।

এমন সময় পিছনে ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেই শশীশেখর চমকিয়া উঠিল। দেখিল পিসি তাহার কাঁকাল ইতে জল ভর্ত্তি পিতলের কলসীটা মেঝের উপর নামাইয়া ডাকিল, 'শশী॥

শশীশেখর উঠিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদি ত বলিল, 'মা কেন কথা কইছে না পিসিমা?'

বুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া একটুখানি পিছাইয়া গেল।—'ছুঁসনে বাছা ছুঁসনে —আমার কাচা কাপড়। দাঁড়া, দেখি—আগে সন্ধ্যে দিই।'

বলিয়া অন্ধকারেই বুড়ী আন্দাজি একটা কুলুঙ্গির উপর হাত্ড়াইয়া হাত্ড়াইয়া দিয়াশালাই বাহির করিয়া প্রদীপটা জ্বালিতে গিয়া বলিল, 'কিগো বৌ, কেমন আছ? ঘুমোচ্ছ নাকি!

বৌ-এর কাছ হইতে কোনও জবাব আসিল না। প্রদীপটা জ্বালাইয়া সেটা আঁচল ঢাকা দিয়া বুড়ী তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইতে গেল। দেবতাদের সন্ধ্যা দেখাইয়া প্রণাম করিয়া তুলসীতলার একটু খানি মৃত্তিকা হাতে লইয়া শশীশেখরকে বলিল, 'নে, হাঁ কর্।'

শশীশেখব হাঁ করিয়া একটুখানি মৃত্তিকা খাইয়া বলিল, 'মাকে দেবে না?'

কথাটা পিসিমার ভাল লাগিল না। বলিল, 'কেন, তোর মাকে কোনোদিন দিই না নাকি? অপবাদ দিচ্ছিস কেন রে ছোঁড়া?'

বলিয়া দুইটি আঙ্গুলে আরও একটুখানি মৃত্তিকা লইয়া বুড়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্।'

শশীশেখর আগে আগে তাহার মা'র শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হাঁ কর মা, তুলসীতলার মিত্তিকে নাও।'

হাঁ সে করিয়াই ছিল। ভিজা কাপড়ে বুড়ীর আর বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব। প্রদীপ[illegible]পিলসুজের উপর নামাইয়া দিয়া আপনমনেই বলিতে লাগিল, 'ছোঁব[illegible]ছোনাটা? তা আর কি করি বল।—[illegible] বলি অ-বৌ, একবার হঁ[illegible]কর ত বাছা!'

বলিয়া তাহার দুই অঙ্গুলের-ডগায়-ধরা মৃত্তিকাটুকু সে [illegible] তাহার মুখের ভিতর ফেলিয়া দিতে গিয়া দেখিল, শরীরটা তা[illegible] হিম।—না, কই জরজ্বালা কিছু ত' নেই, তবে আর এ [illegible] ঘুমোচ্ছ কেন বাছা?'

বলিতে বলিতে সে তাহার কপালে হাতে গায়ে মাথায় [illegible] পরীক্ষা করিতে গিয়া কেমন যেন চমকিয়া উঠিল।

শশীশেখর বলিল, 'না, কই মা ত ঘুমোয় নি পিসিমা, চেয়ে রয়েছে যে!

বুড়ী চোখে ভাল দেখিতে পায় না, তাই সে যথাসম্ভব ঝুঁকিয়া পড়িয়া একবার নাকের কাছে একবার বুকের উপর হাত রাখিয়া, একবার শশীশেখরের দিকে একবার তাহার মা'র দিকে তাকাইয়া থর থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, শশীশেখরকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'আয়।'

শশীশেখর বলিল, 'কোথায় পিসিমা?'

'আয় না।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে ধরিয়া বুড়ী ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। থমকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া পাশের বাড়ীর উঠানে গিয়া ডাকিল, 'সুরেন আছে বাড়ীতে, কালিদাসী? ভূতনাথ?'

সকলেই বাড়ীতে ছিল। বৃদ্ধার ডাক শুনিয়া সুরেন বলিল, 'কিগো দিদি, কি বল্‌ছ?'

'একবার আয় ত' বাছা আমাদের বাড়ীতে! তোরা সবাই আয়।' 'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে।'

বৌ-এর অসুখের খবর তাহারা সকলেই জানিত, কালিদাসী ভূতনাথ, সুরেন—সকলেই ছুটিয়া আসিল এবং দরজা খুলিয়া প্রদীপের আলোকে বৌ-এর শয্যাপার্শ্বে গিয়া যাহা দেখিল সে-দৃশ্য দেখিবার আশঙ্কা কেহই করে নাই।

কালিদাসী একরকম জোর করিয়াই অনিচ্ছুক শশীশেখরকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বুড়ী কাঁদিয়া সেইখানেই আছাড় খাইয়া পড়িল। সুরেন ও ভূতনাথ সজলচক্ষে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৌ মরিয়াছে।

কিন্তু মরিলেই ত' আর হ্যাঙ্গামা চুকে না। মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে।

এদিকে শশীশেখরকে ধরিয়া রাখা দায়। পিসিমার কান্না সে শুনিতে পাইতেছিল। কালিদাসী যতই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায় ছেলেটা ততই কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, ছুটিয়া ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করে।—মাকে তাহার সে শুধু একটিবারের জন্য দেখিয়া আসিবে। মা ছাড়া তাহার আর কে-ই বা আছে! বুড়ী তাহাকে ভালবাসে না।

পুরোহিত বলিল, 'না না, ধরে' রাখ্‌লে চল্‌বে কেন? অতবড় ছেলে রয়েছে মুখাগ্নি কর্‌তে হবে যে।'

স্থির হইল, ছেলেটাকে আর শ্মশানে লইয়া গিয়া কাজ নাই, গ্রামের বাহিরে জোড়া আমগাছের তলায় মৃতদেহ নামাইয়া শশীশেখরকে দিয়া মুখাগ্নি করাইয়া তাহাকে আবার কোলে করিয়া গ্রামে লইয়া আসিলেই চলিবে।

জোড়া আমতলায় খাটিয়ার উপর মৃতদেহ নামানো হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শশীশেখরকে কোলে লইয়া সুরেন সেইখানে উপস্থিত হইল। শ্মশান-যাত্রীরা মৃতদেহ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার রাত্রি। মিট্‌ মিট্‌ করিয়া মাত্র একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলিতেছিল।

শশীশেখর কি যে ভাবিতেছিল কে জানে। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা জীবনে বোধকরি তাহার এই প্রথম। মাকে তাহার তালপাতার চাটাই বিছানা

ও মাদুর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছল-ছল চোখে নিতান্ত অসহায়েব মত সেই দিক্ পানেই সে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। পুরোহিত আর দেবি করিতে পাবিল না। চাটাই ছিঁড়িয়া মৃতদেহের মুখখানা বাহির করিয়া দিয়া মন্ত্র যাহা বলিবার সে নিজেই বলিল। তাহার পর শশীশেখরেব হাতে জলন্ত একটি পলিতা ধবিয়া দিয়া পিছন ফিরাইয়া বলিল, 'এমনি করে' দাও ত বাবা ওই পল্‌তেটা তোমার মা'র মুখের উপর ফেলে'।'

কিন্তু জলন্ত পলিতা সে তাহার মা'র মুখের উপর ফেলিবে কেমন করিয়া! শশীশেখর ইতস্তত করিতেছিল। পুবোহিত এক রকম জোর করিয়াই সেটা তাহার হাত হইতে ফেলিযা দিল। মৃতদেহের উপব পড়িয়া সেটা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ছেলেটা আবার তাহা হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, সুরেন তাহাকে তাহার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিযা আনিল।

পুরোহিতের ইঙ্গিতে শ্মশান-বন্ধুরা আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ খাটখানা কাঁধের উপব তুলিয়া লইয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

অত বড় ছেলেকে বারে-বারে কোলে নেওয়া সহজ কথা নয়, সুরেন্দ্রনাথও শশীশেখরের মাথায় হাত দিয়া বলিল, 'চল্‌।'

কিন্তু শশীশেখর কিছুতেই যাইবে না।

তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সুরেন গ্রামের দিকে ফিরিল।

শশীশেখর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—চারিদিক্ অন্ধকার, আর সেই

২

অন্ধকারের মাঝখানে সামান্য একটুখানি লণ্ঠনের আলোক,—অস্পষ্ট কতকগুলি লোকের স্কন্ধে তাহার মাতার মৃতদেহ এবং মাঝে মাঝে তাহাদের সমস্বরে চীৎকার—"হরি-বোল্!'

সুরেন কি ভাবিল কে জানে। ডাকিল—'শশী!'

'উঁ।'

'মাকে ওরা নিয়ে গেল, অসুখ করেছে কি না, গঙ্গায় স্নান করিয়ে আবার ফিরে' নিয়ে আস্‌বে।'

শশীশেখর একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'হুঁ।"

সুরেন আবার তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'তুমি কেঁদো না শশি! বুঝ্‌লে? কাঁদ্‌তে নেই। কাঁদ্‌লে মা রাগ কর্‌বে।'

কোনও জবাব না দিয়া শশীশেখর আবার পশ্চাতের অন্ধকারের দিকে সজলচক্ষে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

বুড়ী তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে যায়—অন্ধকার ঘর, মা যেখানটায় শুইয়াছিল, শশীশেখর সেইদিকপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, মনে হয় যেন মা তাহার এখনও সেইখানে শুইয়া আছে। ধীরে-ধীরে ডাকে, —'মা!'

চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসে।

চোখের জল মুছিয়া আবার ডাকে, 'মা!'

কিন্তু কোথায় মা? বুড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই প্রদীপের ছটায় দেখা

যায়, কোথাও কিছুই নাই! দেওয়ালের কাছে আন্‌লায় তাহার মায়ের কাপড়খানি তখনও তেমনি ঝুলিতেছে।

ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি বাহিরে সে উঠানে আসিয়া দাঁড়ায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া অনেক কষ্টে পিসিমা, তাহাকে ও-পাড়া হইতে এইমাত্র ধরিয়া আনিয়াছে, আবার হয়ত কোথাও পালাইবে ভাবিয়া পিসিমা ডাকিল, 'ওরে ও ছোঁড়া, তোকে নিয়ে আর পারলাম না দেখছি। খেয়ে নিবি আয়।'

শশীশেখর তখন ঊর্দ্ধে, আকাশের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, মানুষ মরিয়া স্বর্গে গিয়া বোধকরি তারা হয়; কিন্তু ওই অতগুলা তারার মধ্যে কোন্‌টি তাহার মা কে জানে!

সঙ্গী সাথীদের বাড়ী শশীশেখর খেলা করিতে যায়, মেয়েরা তাহাকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলে, 'ওরে ও শশী, শোন্!'

নিতান্ত অপরাধীর মত শশী কাছে গিয়া দাঁড়ায়।

মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেহ বলে, 'আহা বাছারে, মাথায় একটু তেল পড়ে নি। মা না থাকলে কে-ই বা করবে বল?'

আবার কেহ-বা হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'হাঁরে, মাকে তোর মনে পড়ে? মা'র জন্যে মন কেমন করে না?'

শশীশেখর সজলচক্ষে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাছে সে অশ্রু কেহ দেখিয়া ফেলে সেই লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারে না।

দয়াময়ী কোন নারী হয়ত তখন এই মাতৃহীন বালকের উপর করুণা করিয়া চোখ টিপিয়া বলে, 'না লো না, মা ওর মরবে কেন? গঙ্গাচান করতে গেছে, আবার আসবে দেখিস্।

কিন্তু চাতুরী বৃথা। ছেলেভুলানো কথায় বিশ্বাস করিবার বয়স তাহার গিয়াছে। ইহাতে তাহার লজ্জা যেন আরও বাড়িয়া উঠে। এইবার সে তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া দুষ্টু ছেলের মত সেখান হইতে পলায়ন করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

হঠাৎ কোন্ সময় ফস্ করিয়া হাতটা টানিয়া লইয়া সেই যে সে ছুটিয়া চলিয়া যায়, ভুলিয়াও আর সে-পথ কোনোদিন মাড়ায় না।

গ্রামের পাঠশালায় শশীশেখর পড়িতে যায়।

'দীনবন্ধুদাদা'র গল্পটি পড়িতে তাহার বড় ভাল লাগে। গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন। ছাত্রদের উপর জিনিষপত্র সংগ্রহের ভার। নিতান্ত দরিদ্র এক অসহায়া বিধবার একটী ছেলের উপর ভার পড়িয়াছে দই সংগ্রহ করিবার। নিজেরাই পেট ভরিয়া দু'বেলা খাইতে পায় না, বিধবা মা তাহার অতিকষ্টে সংসার চালায়,—অতগুলি ব্রাহ্মণভোজর্নের দই সে সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! মা বলিল, 'কি করি বাছা, আমাদের ত' একমাত্র দীনবন্ধু ছাড়া আর কেউ নাই।'

নিরুপায় বালক তখন গ্রামপ্রান্তে এক নির্জ্জন বাগানের ধারে গিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধুদাদা! দীনবন্ধুদাদা!'

ঘন বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হতে হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। হাতে তাহার ছোট একটী দই-এর ভাঁড়।

বালক সেই ছোট দই-এর ভাঁড়টী হাতে লইয়া গুরুমহাশয়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইতেই তিনি ত' রাগিয়া আগুন! ওইটুকু ত' দই, উহাতে অতগুলি ব্রাহ্মণ-ভোজন হওয়া অসম্ভব। রাগিয়া তিনি ভাঁড় আর স্পর্শ করিলেন না, দধিভাণ্ড সেইখানে পড়িয়া রহিল। কিন্তু হঠাৎ একটা

কাক আসিয়া ভাঁড়টা উলটাইয়া ফেলিয়া দিতেই দেখা গেল, ভাঁড় হইতে প্রচুর দই মাটীতে গড়াইয়া পড়িল, অথচ ভাঁড় তেমনি কানায় কানায় পরিপূর্ণ। অবশেষে সেই ছোট ভাঁড়টি তুলিয়া লইয়া কে একজন ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতে সুরু করিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, নিমন্ত্রিত সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দই খাইয়াও ভাঁড়ের দই আর কিছুতেই শেষ করিতে পারে না। অবাক কাণ্ড! বিস্মিত হইয়া ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ভাঁড় তুই কোথায় পেলি বল্ দেখি?' ছেলে বলিল, 'আমার দীনবন্ধুদাদার কাছে।'

'দেখাতে পারিস্ তোর দীনবন্ধুদাদাকে?'

'হ্যাঁ, পারি।' বলিয়া গুরুমহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন কৌতূহলী ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বালক পুনরায় সেই বাগানের কাছে গিয়া ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধুদাদা! দীনবন্ধুদাদা!'

কিন্তু কোথায় দীনবন্ধু!

অবিশ্বাসী ওই অতগুলি লোকের সুমুখে দীনবন্ধু আর আসিলেন না।

এই দীনবন্ধুদাদার গল্পটি শশীশেখর বারে-বারে পড়ে।

পড়ে আর মনে হয়, ওই বালক যেন সে নিজে। সেও যদি অমনি নির্জ্জনে গিয়া তার মাকে ডাকে ত' তাহার মা নিশ্চয়ই একবার তাহাকে দেখা দিয়া যায়......

সন্ধ্যা হোক্,—গ্রামের উত্তরদিকের ওই পাকা সরকের ধারে, নির্জ্জন ধানের মাঠের পাশে গিয়া সে তাহার মাকে আজ ডাকিবে। চোখ বুজিয়া শশীশেখর মনে-মনে কল্পনা করিতে লাগিল—মা যেন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শশীশেখর তাহার কোলে মাথা রাখিয়া খুব

খানিকটা কাঁদিয়া বলিতেছে, 'এম্‌নি করে' রোজ তুমি আমায় দেখা দিয়ে যেয়ো মা, তোমায় না দেখে যে আমি······'

এমন সময় গ্রামের পথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কিসের ঘণ্টা দেখিবার জন্য শশীশেখর ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে—হিন্দুস্থানী এক ফিরিওয়ালা মাথায় আমসত্ব, খেজুর ও পাকা কলার ডালি লইয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া ছেলে ডাকিতেছে।

শশীশেখর ছুটিয়া তাহাব পিসিমার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'পিসিমা!'

বুড়ী পিসিমা রান্না কবিতেছিল। বৌ মরবার পর হইতে যেমন করিয়াই হোক, তাহাকেই রান্না করিতে হয়। বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া আপন-মনেই বকে আর রান্না করে।

পিসি বলিল, 'রান্নার সময় জ্বালাস্‌নে শশী, কি বলছিস্‌ কি?'

শশীশেখর বলিল, 'একটি পয়সা দাও না পিসিমা, পাকা কলা কিন্‌ব।

পয়সার নামে পিসিমা জ্বলিয়া উঠিল।—'আ-মর্‌, পয়সা কোথা পাব রে, পয়সা কোথায় পাব? তোর মা বুঝি পয়সা আমায় রাখতে দিয়ে গেছে! যা—পয়সা নেই, যা, বেরো এখান থেকে!'

ম্লানমুখে শশীশেখর বাহিরের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। ছেলেরা তখন ফিরিওয়ালাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।—এ-কথাও মাকে তাহার বলিতে হইবে।

সন্ধ্যায় সরকের ধারটা প্রায় নির্জ্জন হইয়া আসে। মুদীর দোকানের জিনিষ বোঝাই করিয়া সহরের ফেরত দু'একটা গরুর গাড়ী কদাচিৎ যাওয়া-আসা করে। নূতন-পুকুরের পাড়ে ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়া লুকাইয়া শশীশেখর শড়ক পার হইয়া ধানের মাঠে গিয়া নামিল।

গ্রীষ্মকাল চারিদিকে শুকনো মাঠ খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথাও জনপ্রাণী নাই। অনুচ্চকণ্ঠে শশীশেখর ডাকিল 'মা!'

আবার ডাকিল 'মা!

নিস্তব্ধ পল্লীপ্রান্তরে এবার তাহার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তবু তাহার মা'র দেখা নাই। এখনও বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। তাই সে এবার বেশ জোরে জোরেই ডাকিল, 'মা!'

ডাকিবামাত্র চোখদুইটা তাহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল এবং তাহার সেই সজল চক্ষের ঝাপ্‌সা-দৃষ্টির সম্মুখে দেখিল, কোথা হইতে চিত্র-বিচিত্রিত নাম-না-জানা চমৎকার একটি পাখী উড়িতে উড়িতে তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। শশীশেখর ভাবিল, মা কি তবে তাহার মরিয়া পাখী হইয়া জন্মিয়াছে? তা' যদি হয় ত' পাখীটি নিশ্চয়ই তাহার আরও কাছে আসিয়া বসিবে।

শশীশেখর ধীরে-ধীরে পাখীটির দিকে হাত বাড়াইল। ভাবিয়াছিল সে কাছে আসিবে, কিন্তু আসিল না। হাত বাড়াইবামাত্র পাখীটি উড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গেল কে জানে!

শশীশেখরের সেখান হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না অথচ সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। ভাবিল, মা তাহার আজ না আসুক, এমনি করিয়া প্রতিদিন ডাকিতে ডাকিতে একদিন সে আসিবেই। মা কি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে কখনও?

অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শশীশেখর বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, পিসিমা

বোধকরি তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইবার জন্য তখন সদর দরজায় তালা বন্ধ করিতেছে।

পিছন হইতে শশীশেখর বলিল, 'আমি এসেছি পিসিমা।'

অনেকক্ষণ হইতেই পিসিমা তাহার উপর রাগিয়া আগুন হইয়াছিল। হাতের তালা দিয়াই তৎক্ষণাৎ সে তাহার মাথার উপর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, 'বেরো' তোকে আর ঘরে ঢুকতে হবে না হতভাগা! বলি, না আহা, মা-মরা ছেলে মানুষ করি। ও মা, ছেলে ত' নয়—শয়তান। হবে না? মা কেমন ছিল? যেমন মা, তার তেম্নি ছেলে হবে ত'!'

বলিতে বলিতে সে দরজা খুলিল। মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'আ, আবার কান্না গ্যাখো! কেন, আমি কি খুন করে' দিলাম নাকি? ওরে ও ছোঁড়া, লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে কেঁদে কেঁদে আর দুষ্‌মণ হাসাতে হবে না—আয়!'

বলিয়া পিসি তাহার হাতে ধরিয়া চড়্‌চড়্‌ করিয়া টানিতে টানিতে ঘরে লইয়া গেল। শশীশেখরের মাথাটা বোধকরি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কান্না তাহার তখনও থামে নাই।

বুড়ী বলিল, 'দাঁড়া, তোকে কালই আমি দিয়ে আসছি। মামা ত' তখন নিয়ে যেতে চাইলে—গেলিনে কেন হতভাগা? গেলিনে কেন? চল্ আমি তোকে সেইখানেই দিয়ে আসি।' দিয়া সে তাহাকে আসিত কিনা কে জানে:

কিন্তু তার পরের দিন—

পিসি স্নান করিতে গিয়াছে, শশীশেখর বাড়ীতে একা।

মায়ের জিনিষপত্র এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে শশীশেখরের

হঠাৎ নজর পড়িল—মা'র একটি ছোট কাঠের হাত-বাক্সের উপর। এই বাক্সটির মধ্যে মা'র একটি 'রামায়ণ' আছে। সময়ে-অসময়ে প্রায়ই সে ওই রামায়ণখানি পড়িত এবং রোজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া শশীশেখরকে কোলের কাছে টানিয়া রাম-সীতার গল্প বলিত।

রাবণ তখনও মরে নাই; লঙ্কায় যুদ্ধ চলিতেছে,—এমন সময়ে তার মার হইল জ্বর। শশীশেখর ভাবিল, সে ত' পড়িতে জানে, বাক্স হইতে রামায়ণখানি বাহির করিয়া রাম-সীতার গল্পটি সে নিজেই পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।

অনেক খুঁজিয়া অনেক কষ্টে শশীশেখর চাবীর তোড়াটা বাহির করিল তাহার পর বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, সেলাইর আসবাবপত্র রহিয়াছে। মা'র নিজের হাতের সেলাই। নিজের হাতে বাক্সটি সে সাজাইয়া রাখিয়াছে। শশীশেখর একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিক্ পানে তাকাইয়া থাকিয়া রামায়ণখানি বাহির করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে গিয়া দেখে, বাক্স বন্ধ কিছুতেই হয় না। জিনিষপত্র আবার আগাগোড়া নামাইয়া ভাল করিয়া সাজাইতে হইবে। তাহাই সে করিতেছে, এমন সময়ে পিসিমা হাঁকিল, 'শশী!'

চমকিয়া শশীশেখর পিছন ফিরিয়া দেখিল, স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বুড়ী তখন দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, 'পায়ে একটু জল ঢেলে দিয়েযা ত বাবা, আসতে আসতে মনে হলো এঁটো পাতা না কি যেন একটা মাড়ালাম।'

শশীশেখর বলিল, 'যাই'।

কিন্তু 'যাই' বলিয়াই সে বড় বিপদে পড়িল। বাক্সের অর্দ্ধেক জিনিষপত্র তখন সে নামাইয়া রাখিয়াছে, পিসিমা যদি এ-কাণ্ড তাহার দেখিতে

পায় ত' বাকি কিছু রাখিবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি খোলা বাক্সটা আড়াল করিয়া জিনিষগুলি কোনোরকমে তুলিয়া রাখিতেছিল ; দেরী হইতেছে দেখিয়া পিসিমা চৌকাঠের ওপর হইতে উঁকি মারিয়া চোখ মিট্‌মিট্‌ করিয়া বলিল, 'কোথায় তুই ? কি করছিস্ ?'

ভয়ে শশীশেখর সাড়া দিল না।

কিন্তু স্পষ্ট দিবালোকে একেবারেই না দেখিতে পাইবার মত কানা সে নয়, পিসিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে ও বাস্কোর কাছে কি করছিস্ শুনি ?'

শশীশেখর থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এবার আর গোপন করিবার উপায় নাই ; বলিল, 'বাক্সটা বন্ধ হচ্ছে না, পিসিমা !'

ভাত

বাক্সর নামে এঁটো পাতা মাড়ানোর কথা পিসিমা বোধকরি ভু' গেল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া প। দিক বলিল, 'কার বাস্কো খুলেছিস্ রে ছোঁড়া ? আমার ? না তোর মায়ের ড়ী ও সব্বনাশ ! ওরে হারামজাদা, ওরে লক্ষীছাড়া—'

বলিয়া বুড়ী তাহাকে যেমনি হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইবে, শশীশেখর রামায়ণখানি তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

পিসি তাহার পিছু পিছু খানিকটা ছুটিয়া আসিয়া চেঁচাইতে লাগিল, 'কই দেখি রে দেখি—কি নিয়ে পালালি······টাকাকড়ি না গয়না-গাঁটি··· ···গেল-গেল-গেল-গেল আমার সব গেল রে······দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে আমার সব গেল !'

বলিয়াই সে আবার বাক্সর কাছে ফিরিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কি গিয়াছে না গিয়াছে দেখিবার আগেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা

করিয়া বসিল, যে আজ হোক্ কাল হোক্—যে কোনোপ্রকারে সে ওই দস্যি ছেলেটাকে তাহার মামা-মামীর কাছে রাখিয়া আসিবে, তাহার পর অন্য কথা।

বেলা প্রায় চারটার সময়ে একহাতে শশীশেখরের কান ধরিয়া আর-এক হাতে মোটা রামায়ণখানি লইয়া ও-পাড়ার যোগীন আসিয়া দাঁড়াইল—'ওগো ও দিদি, এই নাও তোমার শশীর কাণ্ড দ্যাখো! ও-পাড়া থেকে আসছি, দেখি না আমাদের গোয়ালের পাশে—তেঁতুল-গাছের তলায় একটা শেকড়ে মাথা দিয়ে শশী ঘুমোচ্ছে। আর এই রামায়ণখানা কোথা ও পেলে ছাখো ত' দিদি! এইখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ;—এই এত বড় মোটা বই—মুখের ওপর চাপা দেওয়া ; নিজে একটু হ'লে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো যে রে হারামজাদা!' বলিয়াই শশীকে করিয়া শশীর মাথায় এক চড় মারিয়া বলিল, 'না দিদি, একে খানিকটু শাসন কোরো, নইলে দিন-দিন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ছে ছেলেটা। সেদিন অম্‌নি—'

বলিয়া যোগীন বোধকরি ছেলেটার আরোও দুস্কৃতির কথাই বলিতে যাইতেছিল, বুড়ী পিসি তাহার আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'তবে বোসো যোগীন, শোনো তবে, শুনেই যাও। শেষে তোমরা এই পিসির দোষ দিও না। ছেলে ত' নয়—ডাকাত!'

পিসি সেইখানেই বসিল। বসিয়া যোগীনের কাছে তাহার ও-বেলার ডাকাতির কথাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিল, 'বৌএর গয়না-গাঁটি ত' কম ছিল না, টাকাকড়িও কিছু না থাক্……নাই নাই করে'ও কিছু ছিল, কিন্তু এম্‌নি ও ছেলের গুণ,—কোন ফাঁকে কোন্ দিক্ দিয়ে যে নিয়ে

পালালো—নিয়ে কাকে যে দিলে, কি যে করলে ও-ই জানে। ...ওইটুকু ত' ছেলে······চোখে ভাল দেখতে পাই না কিনা········ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে মানুষ করি, আহা মা-মরা ছেলে······না, কাজ নেই ভাই আমার অমন ছেলে মানুষ করায়—ওর মামার বাড়ীতে দিয়ে আসি। কালই যাব।'

যোগীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই যাও দিদি, নইলে তুমি ও ছেলেকে পারবে না।'

পরদিন মামার বাড়ী যাইবার সবই ঠিক। ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে মাত্র মিনিট-পাঁচেকের পথ। বুড়ী নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। শশীশেখরের জামাকাপড় বই শেলেট্—সবই একটা পুঁটুলীতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বুড়ী রান্না করিতেছে। ভাত চারিটি মুখে দিয়াই তাহারা ষ্টেশনে গিয়া বারোটার ট্রেণ ধরিবে।

নিতান্ত বোকার মত হাঁ করিয়া শশীশেখর ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। এই ঘরে আর-কোনোদিন সে আসিবে কিনা কে জানে। বুড়ী না আসিতে আসিতে রামায়ণখানি সে তাহার পুঁটুলীর মধ্যে ঢুকাইয়া লইল।

মা'র ওই আন্‌লায় ঝুলানো কাপড়খানি···

শশীশেখর হাত বাড়াইয়া সেখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, তাহাতেই তাহার চোখের জল মুছিয়া ঘরের অন্ধকার কোণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া চোখ বুজিয়া ডাকিল, 'মা!'

ডাকিবামাত্র গলার আওয়াজ তাহার ভারী হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

চুপি-চুপি বলিল, 'মা, আমি মামার বাড়ী চললাম।' বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া আসিতেছিল। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'তুমিও যেয়ো।'

ঠিক এই সময়ে দেওয়ালে একটা টিক্‌টিকি কোথায় যেন টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল।

এদিক ওদিক তাকাইয়া শশীশেখর নিশ্চিন্তমনে গোপনে চোখ মুছিয়া ভাবিল, মা তাহার কথাগুলি নিশ্চয়ই শুনিয়াছে, তাহা না হইলে টিক্‌টিকি কখনও বিনা কারণে টিক্‌টিক্ করে না।

কাল রাত্রেও সে যখন বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনে-মনেই মাকে বলিতেছিল—'তোমার গয়না-টয়না পয়সা-টয়সা কিছু আমি নিইনি মা, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না, বুড়ী মিছে করে' বলছে। তখনও ঠিক ওই টিক্‌টিকিটাই এমনি করিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছিল—তাহার মনে আছে।

শশীশেখর উপরের দিকে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেওয়ালের গায়ে টিক্‌টিকিটার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

মামার সন্তানাদি কিছু হয় নাই, কাজেই মামীমা তাহার দুইটি ভাইকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ভাই দুটি ছোট। একটি শশীশেখরের সমবয়েসী, আর-একটি তাহার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। মামা বলিল, 'ভালই হয়েছে, শশীকে আপনি নিয়ে এসেছেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। সেখানে স্কুল নেই, ছেলেটার লেখাপড়া কিছু হ'তো না, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।'

পিসি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, লেখাপড়া ওর...'

বলিয়াই বোধ করি শশীশেখর সম্বন্ধে খারাপ কিছু সে বলিতে যাইতে ছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া একটা ঢোক গিলিয়া চুপ করিল।

শশীশেখরকে রাখিয়া বুড়ী সেইদিনই ফিরিয়া যাইতে চাহিল, শশী-শেখরের মামা ভবেশ নিষেধ করিল। বলিল, 'না না, তাই কি হয় নাকি কখনও?'

কিন্তু মামী কনকবরণী বলিল, 'তা—তা আজই যাবেন ? তা—হ্যাঁ, একলা মানুষ, খালি ঘর ফেলে এসেছেন, আজকালকার দিনে চোর-ডাকাতের ভয়···ওরে ও নুরু!'

বলিয়া চাকরটাকে কাছে ডাকিয়া বুড়ীর সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিয়া আসিবার জন্য অনেক করিয়া বারে-বারে তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিল।

থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও বুড়ীর আর থাকা হইল না।

যাহবার সময়ে কনকবরণী বুড়ীকে একটু খানি জল খাওয়াইয়া এক-খিলি পান হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরঝির গয়না-টয়নাগুলি ভাল করে'···'

বুড়ী বলিল, 'ওই গ্যাখো, ওই কথাটি বলি বলি করেও বলা হচ্ছিল না ভাই, শোনো তবে বলি। বোসো।' বলিয়া বুড়ী তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিতে লাগিল, 'সে-কথা আর বলো কেন, ছেলে ত' নয়-ডাকাত! চোখে ভাল দেখতে পাই মা মা—ওই গ্যাখো, যা বল্‌ছি,—চোখে ভাল দেখতে পাই না দিদি, মনেরও কি আর ঠিক আছে ছাই! চাবির গোছাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম। তা, ও-ছেলের কাছে কি লুকিয়ে রাখবার জো আছে নাকি? চোখ থেকে চোখের কাজল চুরি করে

চাবী বেঁধে করে' 'বাস্কো 'খুলে' গয়নাগুলি কখন্ যে বের করে' নিয়েছে দিদি, কিছুই বুঝলাম না। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল। দেখি না, ওমা, অত-অত গয়না, তা একটা নাক্‌ছবি ফেলে' রাখ্! তাও নেই টাকাকড়ি গয়না গাঁটি······কোথাও কিছু নেই, পায়ের ক'টা রূপোর আংটি—তাই শুধু ফেলে' রেখেছে। ছেলেটাকে কত মারলাম, কত শাসন করলাম; বল্‌ল'ম, বল্ কাকে দিয়েছিস্ হারামজাদা, বল্, আমি তার কাছে যেমন করে' হোক্ বের করে' নিয়ে আসি। কিন্তুক্······উঁহুঁ।'

বলিয়া প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বুড়ী বলিল, 'কার বাবার সাধ্যি বলায়। বল্‌লে না—কিছুতেই।······শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি ভাই, বলি, যাক্—থাকলে তোরই থাকতো, গেল ত' তোরই গেল।'

কথাগুলা শুনিয়া কনকবরণী গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'তাহ'লে ত' আমাকেও দেখছি ও-ছেলে······'

'হ্যাঁ ভাই, কি আর করবে বল, তোমার একজন আছে, একটুখানি চোখে-চোখে···'বলিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

কনক বলিল, 'ও-কথা তুমি ওর মামাকে একবার বলে' যাও দিদি।'

হাঁ হাঁ' করিয়া হাত নাড়িয়া বুড়ী বলিল, 'থাক্ ভাই ও তুমিই বোলো। বুড়ো মানুষ···টেরেণ না পেলে আবার আঁধারে কোথায় প'ড়ে মরব দিদি ···তার চেয়ে···কই বাবা হারু, না কি নাম বললে চাকরটার?'

সুরু দাঁড়াইয়াই ছিল। বলিল, 'আসুন'।

স্ত্রীর কথা ভবেশ বিশ্বাস করিল না। হাসিয়া বলিল, 'পা'গল! তাই কি হয় নাকি কখনও? ওই অতটুকু ছেলে! বুড়ীর মতলব খারাপ।'

কনকবরণী বলিল, 'হ'তে পারে। কলিকালের ছেলে—কিছু বিশ্বেস নেই!'

কথাটাকে ভবেশ উড়াইয়া দিল! গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্‌গে! বোন্‌টাই যখন গেল! ক. আর এমন গয়না ছিল।'

বলিয়া শশীশেখরকে কাছে ডাকিয়া ভবেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'মাথায় এত চুল কেন রে বোকা? এত চুল রাখে কখনও? ওগো শুন্‌ছো? মুরুকে ব'লে একটা নাপিত ডাকিয়ে চুলগুলো এর কাটিয়ে দিয়ো ত' ভাল করে'! আর গায়ে বেশ করে' সাবান মাখিয়ে দিয়ো! হ্যাঁগা, দর্জ্জিটা আবার আসবে বলে' গেল, না।'

কনক বলিল, 'কেন? দর্জ্জি কি হবে?'

ভবেশ বলিল, 'আচ্ছা থাক্, বিকেলে আজ ওকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব।'

কনক বলিল, 'তাহ'লে অম্‌নি সেণ্টু মেণ্টকেও নিয়ে যেয়ো।'

ভবেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যাব।'

শশীশেখর তখনও হেঁটমুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। মামা তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল।

'ছি ছি, পা-দুটো অমন কেন হয়েছে রে, এ্যাঁ? খুব দুষ্টুমী করে' বেড়া'স্, না? জুতো পায়ে দিস্‌নে কেন?'

শশীশেখব কিছু না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

মৃদুকণ্ঠে শশীশেখর কহিল, 'জুতো যে নেই।'

ভবেশের কি যে অভ্যাস—ছোট ছেলেপুলে ঘরে থাকিলে একা

বসিয়া কিছুতেই সে খাইতে পারে না। সেণ্ট, মেণ্ট দুই শ্যালককে দুই পাশে বসাইয়া খাওয়ায়।

স্ত্রী বলে, 'আচ্ছা, ওদের আমি দিচ্ছি, তুমি খাও না বাপু! ওদেরই খাওয়াচ্ছ ত,' নিজে খাবে কখন্?'

ভবেশ বলে, 'খাচ্ছি। খাচ্ছি'। আমার সঙ্গে খেতে ওরা ভালবাসে।'

এবার আবার আর-একজন বাড়িয়াছে—শশীশেখর।

শশীশেখরের লজ্জা করে। সহজে সে কিছুতেই বসিতে চায় না। ভবেশ শেষে বাঁ হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া একেবারে কোলের কাছে বসাইয়া বলে, 'খা।'

খাইতে বসিয়া শশীশেখরের বিপদের আর সীমা থাকে না। এত আদর-যত্ন তাহার কেমন যেন অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। মাকে তাহার মনে পড়িয়া যায়। হেঁটমুখে খাইতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার অকারণেই জলে ভাসিয়া আসে। একটি বারের জন্যও সে মাথা তুলিতে পারে না। অথচ কাপড়ের বদলে হাফ্-প্যাণ্ট পরা। কোঁচার খুঁটে কোনও একটা ছুতা করিয়াও যে চোখ মুছিয়া মাথা তুলিবে তাহারও উপায় নাই।

এম্‌নি প্রায় প্রতিদিন।

কিন্তু ইহা আর এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার কিছু নয়, যাহার জন্য কনকবরণীর রাগ হইতে পারে।

অথচ রাগ তাহার হয়।

ভবেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে তাহাতেই দিন তাহার ভাল চলে। তবু একটা কাজকর্ম্ম না করিলে ভাল দেখায় না বলিয়াই বোধকরি যা-হোক্ কিছু করে। হাতের কাছেই

আদালত। মোক্তারীটাও পাশ করা আছে। কাজেই কালোরঙের সাম্‌লা পরিয়া ভবেশ রোজ আদালতে যায়, আবার যখন-খুশী ফিরিয়াও আসে।

ভবেশ সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়াই দেখে, বৌএব মুখ ভারী, ভাল করিয়া কথা কয় না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি গো, কথা কও না যে ?'

কনকবরণী মুখ ফিরাইয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল, আধ ঘণ্টা খানেক্ তাহার আর দেখা নাই।

শশীশেখরের নূতন পোষাক আসিয়াছে। পোষাকে তেমন বৈচিত্র্য কিছু নাই, রঙিন খদ্দরের হাফ্-প্যাণ্ট্ এবং তাহারই সার্ট্। তবু তাহার সেই ধপ্‌ধপে রঙের উপর লাল-টকটকে' কাপড় এমন সুন্দর মানাইতেছিল যে ভবেশ সেদিক্ হইতে তাহার আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করছিস রে শশী ?'

শশী তখন একাকী জানালাব ধারে বসিয়া মা'র সেই রামায়ণখানি পড়িতেছিল। বলিল, 'পড়ছি।'

বলিয়াই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা মামা, কপি মানে বাঁদর, না ?'

ঘাড় নাড়িয়া ভবেশ বলিল, 'হ্যাঁ, ওটা কি বই রে ? তোর পড়বার বই ?'

'না। রামাযণ।'

'রামায়ণ ?'—ভবেশের ইচ্ছা করিল, স্ত্রীকে তাহার ডাকিয়া আনিয়া দেখায়—শশীশেখর ওইটুকু ছেলে, রামায়ণ পড়িতেছে এবং কপি মানে যে বাঁদর—তাহাও সে জানে।

হয়ত এই সূত্রে রাগটাও তাহার পড়িয়া যাইতে পারে, ভাবিয়া ভবেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সানন্দে খবরটা তাহার স্ত্রীকে দিবার জন্য ঘরের ভিতর গিয়া ডাকিল, 'কই গো! কোথায় তুমি?'

সবেমাত্র তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। কনকবরণী আর্শীর সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথার চুল আঁচ্‌ড়াইতেছিল—কথা বলা দূরে থাক্, একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

ভবেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কিগো, চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছ?'

কনকবরণী বলিল 'না। সাঁতার কাট্‌ছি। কেন? কাণা ত' নও, দেখতে পাও না?'

ভবেশ ত' অবাক্! বলিল, 'রাগের কারণটা কি শুনতে পাই না?'

ঘাড় নাড়িয়া কনক বলিল, 'না।'

ভবেশ বলিল, 'এসো দেখবে এসো।—শশী আমাদের ওইটুকু ত' ছেলে, কি রকম গম্ভীব হয়ে জানলার কাছে বসে' বসে' রামায়ণ পড়ছে দেখে যাও।'

কনকববণী দপ্‌ করিয়া যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, 'তুমি দ্যাখগে যাও।'

এমন সময়ে ঝি আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই কথা আর তাহাদের অগ্রসর হইল না—প্রেমালাপে বাধা পড়িল।

রাত্রে ভবেশ খাইতে বসিয়াছে। সেণ্টু, মেণ্টুকে আজকাল আর ডাকিতে হয় না। আপনা হইতেই ঝুপ্‌ করিয়া দু'জন দু'পাশে আসিয়া বসিয়া পড়ে।

ভবেশ ডাকিল, 'শশী!'

বইখানি বন্ধ করিয়া শশী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া মামা যে-ঘরে খাইতে বসিয়াছে সেই ঘরে ঢুকিতে যাইবে, অন্ধকার বারান্দার উপর পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন সজোরে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টান মারিল। যন্ত্রণায় সে ধীরে-ধীবে 'উঃ' বলিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিল, আব্‌ছা অন্ধকারে তাহার মামীমা দাঁড়াইয়া আছে। মামী যে তাহার চুল ধরিয়া এমন করিয়া টানিতে পারে সে বিশ্বাস তাহার ছিল না। অবাক্ হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সে তাহার মুখের পানে তাকাইতেই, অন্ধকারে ঠিক একটা হুলো বিড়ালের মত মামীমা তাহার যেন ফোঁস্ করিয়া উঠিল। আবার আর-একবার তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বেশ করিয়া প্রবলবেগে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়া দাঁতমুখ খিঁচাইয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া অনুচ্চকণ্ঠে কি যে কহিল, কিছুই ভাল বুঝা গেল না। মামীমা তাহাকে আর বুঝিবার অবসরও দিল না—ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রান্নাঘরের উনানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, 'বোস্ এইখানে। পিণ্ডি দিচ্ছি খেতে—দাঁড়া! যেই ডেকেছে আর অমনি একেবারে……এঁঃ! ছেলের সোয়াগ্ রাখবার আর জায়গা নেই রে! খবরদার বল্‌ছি—খাবার সময় আর যাস্‌নে ওখানে—চোর, বদ্‌মাস্, পাজি কোথাকার!' বলিতে বলিতে রান্নাঘরের ভিতর হইতে কলাই-করা একটা থালার উপর খানকতক শুক্‌নো রুটি ও একটুখানি তরকারি আনিয়া তাহার সুমুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, 'এইখানে খা বসে' বসে'—আমি আস্‌ছি। এই কথা মামাকে গিয়ে লাগিয়েছিস্ যদি শুন্‌তে পাই ত' খুন করে' ফেল্‌ব।'

বলিয়া সে হন হন্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়া বোধকরি

ভবেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ভবেশ আবার ডাকিল, 'শশী!'

কনকবরণী তখন হাঁপাইতেছে। বলিল, 'রোসো, শশী, শশী বলে' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির হ'য়ে পড়লে যে? শশীর ক্ষিদে পেয়েছিল, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। তুমি খাও।'

ভবেশ একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'সে কি! এই ত' বেখে এলাম সে পড়ছে!'

কনকবরণীর মুখ ভারী হইয়া উঠিল। বলিল, 'বিশ্বাস হ'লো না বুঝি? হ্যাঁ, তা' কেন হবে? আমি কে, যে—আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে!'

ভবেশেব মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া সে হাঁ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

কনকবরণী তার স্বামীকে বলে, 'ছল-চাতুরী আমি জানি নে বাপু, যা করি আমার সব সোজাসুজি।'

সে কথা সত্য! কারণ, শশীশেখরের মত ছেলেমানুষ,—মামীমার মনের ভাব টের পাইতে তাহারও দেরি হইল না। বেশ বুঝিতে পারিল যে, মামীমা তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু কি আর করিবে, পৃথিবীতে আর কেই-বা তাহাকে পছন্দ করে! ওদিকে পিসিমাও যেমন, এদিকে মামীমাও তেম্‌নি। অকারণেই যখন-তখন মামীমার কিল-চড়-লাথি খাইয়া তাই আজকাল তাহার মাকে বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। কিন্তু মা'র সঙ্গে একটি দিনের জন্যও তাহার আর দেখা হয় না যে।

পল্লীগ্রামে সে বরং ছিল ভাল। চারিদিক ফাঁকা। শড়কের কাছে ধানের মাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইলে জনমানবের সাড়াশব্দটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। একেবারে নিস্তব্ধ নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তর। একদিন না একদিন মা'র সঙ্গে দেখা তাহার সেখানে নিশ্চয়ই হইত। আর—এখানে? চারিদিকে লোকজন গাড়ী ঘোড়া শহরেব গোলমাল, রাত্রি গভীর না হইলে কোলাহল থামে না—মা তাহার এখানে আসিবেই বা কেমন করিয়া! মা'র দোষ নাই। সে হয়ত তাহাকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শুধু এই মানুষের গোলমাল হট্টগোলে তাহার আসিবার উপায় নাই।

শশীশেখর তাই এই শহরের মধ্যেও নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়।

স্কুলে সে ভর্ত্তি হইয়াছে। সেণ্ট মেণ্টুর সঙ্গে সকাল-সকাল ভাত খাইয়া নূতন বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে নূতন স্কুলে পড়িতে যায়। টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে একাকী সে বাহির হইয়া পড়ে। স্কুলের পাশেই রেলের লাইন সোজা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গেছে। খানিক্‌দূর হাঁটিয়া গিয়া সে এই লাইনের ধারে একটা গাছের তলায় চুপ করিয়া বসে। জায়গাটা মন্দ নয়। অন্ততঃ লোক-জনের যাওয়া আসা খুব কম। ভাবে, আজ স্কুলের ছুটির পর সে এইদিক পানে একাকী বেড়াইতে আসিবে। মা হয়ত বা এখানে দেখা দিতেও পারেন।

কিন্তু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী গিয়া শশীশেখর দেখে, তাহার রামায়ণ খানি নাই। কোথায় গেল—এদিক্‌-ওদিক্‌ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে ভবেশ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে, খুঁজ্‌ছিস কি?'

শশীশেখর বলিল, 'আমার রামায়ণ।'

'কোথায় রেখেছিলি ?'

'এইখানে।' বলিয়া দেওয়ালের গায়ে কাঠের তাকৃটায় যেখানে তাহাদের বই-দপ্তর শেলেট পেন্সিল থাকে, সেইখানটা দেখাইয়া দিল। মুখখানি তখন তাহার শুকাইয়া গেছে।

ভবেশ বলিল, 'দেখে আয় না ঘরের ভেতর যদি নিয়ে গেছে তোর মামীমা ?'

কিন্তু মামীমার কাছে যাইতে তাহার ভয় করে। কাছে গিয়া দাঁড়াইলেই একটা-না-একটা ছুতা ধরিয়া সে তাহাকে প্রহার করিবে।

করুক্ প্রহার ! মার ওই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ! তাহার নিজের হাতের মলাট্ দেওয়া। রামায়ণখনির জন্য সে সব কিছু করিতে পারে। ভয়ে ভয়ে সে উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখে, সেণ্টু একটা বড় বাটিতে দুধের সঙ্গে কতকগুলা মুড়ি ভিজাইয়া একহাত দিয়া খাইতেছে, আর একহাতে মেঝের উপর রামায়ণখানি খুলিয়া ধরিয়া থামিয়া বেশ জোরে-জোরেই পড়িতে সুরু করিয়াছে; আর মেণ্টু তাহার হাতে একটি বড় রসগোল্লা লইয়া জিব দিয়া চাটিতে চাটিতে একটা পা তুলিয়া আর এক পায়ে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ঘরময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং মামীমা তাহার পিছন ফিরিয়া বসিয়া, লোহার বঁটিটা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বোধকরি শশা কাটিতেছিল।

শশিশেখর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়াই কোনদিকে না তাকাইয়া রামায়ণখানা সেণ্টুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। কাড়িয়া লইয়াই সে

চলিয়া যাইতেছিল, সেণ্টু চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, মেণ্টুও চেঁচাইল, এবং এই দুইটি বালকের তীব্র কণ্ঠস্বরে সহসা চমকিত হইয়া কনকবরণী পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে, কি হ'লো কি? গাধার মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?'

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সেণ্টু বলিল, 'কেন, দেখতে পাও না? বইখানা কেড়ে' নিয়ে গেল যে!'

শশীশেখরকে কনকবরণী দেখিতে পায় নাই, দরজার দিকে তাকাইয়া আন্দাজি ডাকিল,—'ওরে ও ছোঁড়া, ও হতভাগা, শোন্!'

শশীশেখর ফিরিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই কনকবরণী ডাকিল, 'আয়, ভেতরে আয়। কেন রামায়ণটা তো তোর খেয়ে ফ্যালে-নি, অমন করে' হাত মুচ্‌ড়ে' কেড়ে নিয়ে যাওয়া কেন? বোস্ ওইখানে! মামাকে গিয়ে লাগাবি হয়ত—ওরা খাচ্চে, আমায় খেতে দিলে না।—নে বোস ওইখানে।'

বলিয়া একটা বাটির উপর চারিটি মুড়ি ও গোটাদুই শশার ফালি লইয়া তাহার কাছে আসিয়া ঠক্ করিয়া বাটীটা নামাইয়া দিয়া হাত হইতে রামায়ণখানা টানিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মামীমা বলিল, 'বোস্, খা এইখানে বসে' বসে'; তারপর রামায়ণ নিয়ে যেতে হয়—নিয়ে যাস্।'

মেণ্টু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া পা দিয়া ঠিক ফুটবলের মত রামায়ণখানা 'সট্' করিয়া সেণ্টুর হাতের কাছে পাঠাইয়া দিয়া বলিল, 'নে দাদা, পড়বি ত' পড়্!'

কনকবরণী চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়া উঠিল, 'খবরদার বলছি ছুঁস্‌নে সেণ্টু, ও-রামায়ণ তোরা ছুঁস্‌নে, আজই ভাল রামায়ণ আনিয়ে দিচ্ছি।'

'কি রে পেলি রামায়ণ ? পেয়েছিস্ শশী ?' বলিতে বলিতে ভবেশ বারান্দা পার হইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

শশীশেখর তখন মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হঠাৎ এক-কামড় খাইয়া এমন বিপদে পড়িয়াছে, যে মুড়িগুলা মুখ হইতে না ফেলিয়া তাহার আর কথা বলিবার উপায় নাই।

কোনরকমে ঘাড় নাড়িয়া রামায়ণখানি সে যে পাইয়াছে তাহাই জানাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতে বইখানা কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেন গেল, কেহ কিছুই বুঝিল না।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'না খেয়েই পালালি যে, হাঁ রে ও-শশী ?'

কনকবরণী বলিল, 'বুঝতে পারছ না ? তোমায় জানানো হলো, যে ওকে আমি দুধ দিইনি। এই ত' দুধের বাটি দিতে যাচ্ছি, আর ও উঠে' গেল। ছ্যাখো ছ্যাখো—তোমার বড় বড় চোখদুটো নিয়ে ছ্যাখো ভাল করে'।'

এমন সময়ে নীচের উঠান হইতে শশীশেখরের বমির শব্দ পাওয়া গেল।

ভবেশ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে বমি কর্‌ছিস্! শশী ?'

অনুচ্চকণ্ঠে শশী বলিল, 'হুঁ।'

'কেন ?'

উপরের দিকে মুখ তুলিয়া মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া শশী কহিল, 'শশাটা বড্ডো তেঁতো।'

কথাটা আস্তে বলিলেও, কনকবরণী ঘরের ভিতর হইতে তাহা

শুনিতে পাইয়াছিল   বলিয়া উঠিল, 'ওমা, ছ্যাখো দেখি অপবাদ দেওয়া কেমন! তোকে কি আমি বেছে বেছে তেঁতো শশা খেতে দিয়েছি নাকি রে ছোঁড়া? কেন, এরাও ত' খাচ্ছে।'

সেণ্ট বলিল, 'কই আমার শশা ত' তেঁতো নয় দিদি।'

মেণ্টু বলিল, 'আচ্ছা দেখি না খেয়ে।'

বলিয়া শশীশেখরের পরিত্যক্ত বাটি হইতে একফালি শশা তুলিয়া লইয়া কচ্ করিয়া খানিক্টা কাম্ড়াইয়া কচ্‌কচ্ করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া গিলিয়া ফেলিয়া দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'না। তেঁতো ত' নয়।'

ভবেশ ফিরিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, কনকবরণী বলিল, 'ওই বল্ তোদের জামাইবাবুকে।'

ভবেশ বলিল, 'তাহ'লে হয়ত মুড়িতে কিছু ছিল।'

বলিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কনকবরণী বলিল, 'ওগো শুনছো? —একটা রামায়ণ এনে' দিতে পারবে? হাতে পয়সাকড়ি নেই, থাকলে আর তোমায় আমি বলতাম না।'

ভবেশ বলিল, 'কেন, রামায়ণ কি হবে? ওই ত' রয়েছে একটা, ওইটেই পড়ো।'

কনকবরণী গালে হাত দিয়া চোখদুইটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'ও মা গো! দেখলে না? ভাগ্‌নের মূর্ত্তিটা একবার দেখলে বুঝতে পারতে। সেণ্টুর হাতে ছিল, পড়ছিল বেচারা, আমি পিছন ফিরে' বসে' আছি, কিছু জানি নে, ছ্যাক্ করে' কোন্ সময় এসে' এম্‌নি হাতটাকে দিলে ওর চেড়ে'—আর-একটু হ'লে'.....হাঁরে সেণ্টু, বড্ডো ব্যথা করছে, না?'

সেণ্টুর গালে তখন একগাল মুড়ি। স্পষ্ট কথা বলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ।'

কিছু না বলিয়াই ভবেশ চলিয়া গেল। কনকবরণী বলিল, 'তাহ'লে পারবে না আনতে না কি—বলে' যাও পষ্ট করে'।'

বারান্দা হইতে জবাব আসিল, 'আনছি।'

কনকবরণী আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, মেণ্ট বলিল, 'আঃ যাক্ না, যাক্ না। দাও ত' দিদি, একটা রসগোল্লা দাও ত' চট্ করে' —চট্ করে'—'

দিদি বলিল, 'কেন রে? আবার রসগোল্লা কি হবে?'

মেণ্টু মুখখানা তাহার কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'বারে, তেঁতো শশাটা ······তখন জামাই বাবুর কাছে বললাম না······মাইরি তেঁতো—ভারি তেঁতো!'

হাসিতে হাসিতে কনকবরণী মেণ্টর হাতে একটি রসগোল্লা দিয়া মেণ্টুর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'দেখেচিস্, মেণ্ট কেমন চালাক দেখেচিস?'

বলিয়া সে একেবারে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রামায়ণ কিনিয়া দেওয়া হয় নাই; তাহার প্রয়োজনও কনকবরণীর ছিল না, কাজেই সে সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য না হইলেও গণ্ডগোল বাধিল আর-একটা ব্যাপার লইয়া।

রাত্রে সাধারণতঃ তাহারা তিনজনে একসঙ্গে বসিয়াই পড়িত। মাঝখানে একটি লণ্ঠন,—একদিকে বসিত সেণ্টু ও মেণ্টু দু'ভাই, আর-একদিকে শশীশেখর একা। কিন্তু সেণ্টু ছেলেটা এম্‌নি দুষ্ট, যে, লণ্ঠনের

ডাঁটের ছায়াটা যাহাতে শশীশেখরের বই-এর উপর পড়িয়া তাহার পড়ার অসুবিধা ঘটায়, তাই সে বারে-বারে লণ্ঠনের পল্-তোলা ডাণ্ডার দিক্‌টা শশীশেখরের দিকে ঘুরাইয়া দেয়। প্রথম শশীশেখর আপত্তি করিতে ছাড়ে না; কিন্তু পরে যখন দেখে উহাদের সঙ্গে পারিবার জো নাই, আপত্তি করিতে হইলে ক্রমাগত ঝগড়াই করিতে হয়, পড়া আর হয় না, তখন সে মাথাটা একটুখানি নীচু করিয়া আধ-আলো আধ-ছায়াতেই পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। সেণ্টর ঘন-ঘন পিপাসা পায়, বারে-বারে তাহাকে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া যাইতে হয়, কখনও বা নাক ঝাড়িবার প্রয়োজনে পড়া ছাড়িয়া দাঁড়ায়, কখনও-বা মিছামিছি বই খুঁজিবার জন্য দেওয়ালের কাছে তাকটার কাছে উঠিয়া যায়, কখনও বা অন্য কোনও কারণে দিদির কাছ হইতে একবার ফিরিয়া আসে, অথচ যতবার তাহার উঠিবার প্রয়োজন হয় ততবারই সে ফস্ করিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

সেদিন অমনি লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া সেণ্ট ঘরের ভিতর চলিয়া গেছে, অন্ধকারের মাঝে মেণ্ট ও শশীশেখর বসিয়া।

শশীশেখর হঠাৎ 'উঃ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মেণ্ট কোনো প্রকারেই তাহার হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিতেছিল, পাশের ঘর হইতে শশী-শেখরের চীৎকার শুনিতে পাইয়া ঠিক সেই সময়ই লণ্ঠন হাতে লইয়া দরজার কাছে ভবেশ আসিয়া উপস্থিত!

—'কি হলো কিরে! এই বুঝি তোদের······ কোথায় যাচ্ছিস?'

বলিয়া পলায়ন-তৎপর মেণ্টুর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া ভবেশ

শশীশেখরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন শশী?'

শশী বলিল, 'অন্ধকারে বসে' ছিলাম, আমার এই হাতে কি যেন একটা ফুটিয়ে দিয়ে ও ছুটে পালাচ্ছে।'

ভবেশ মেণ্টুর হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কি ফুটিয়েছিস্ বল্!'

মেণ্ট ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া দিয়া বলিল, 'কিছু না। ওকে বিছেয় কাম্‌ড়েছে।'

'কই দেখি।'—বলিয়া ভবেশ তাহার আর একখানা হাত পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, হাত হইতে কি যেন সে তৎক্ষণাৎ মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'ছাখো না!'

কিন্তু ভবেশের কাছে চালাকি তখন তাহার ধরা পড়িয়া গেছে। লণ্ঠন লইয়া একটুখানি এদিক-ওদিক খুঁজিতেই বড় একটা আলপিন্ তাহার হাতে ঠেকিল। রাগের ঝোঁকে মেণ্টুর মাথায় ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া দিয়া ভবেশ বলিল, 'শশী, তুই বই নিয়ে আমার ঘরে পড়বি আয়। এখানে আর বসিস্ নে।'

সেই দিন হইতে শশীশেখর তাহার পাশের ঘরে মামার কাছে পড়িতে বসে।—

এই লইয়া ভবেশকে অনেক কথাই শুনিতে হয়।

কনকবরণী তাহাকে অনেক কথা শুনাইয়া শুনাইয়া নিরীহ ভাই ছুটিকে তাহার উদ্দেশ করিয়া বলে, 'গরীবের ছেলে, 'ভগ্নীপতির বাড়ী জায়গা যদি একটুখানি পেয়েছিস্ ত' ভাল করে' পড়াশুনা করে নে ভাই, ভবিষ্যতে দু'মুঠো খেতে পাবি।'

আবার হয়ত' বলে, 'ভালই-হয়েছে, আলাদা পড়বার ব্যবস্থা করে' দিয়েছে—খুব ভাল হয়েছে তোদের স্কুলের পড়া পড়তে এসেছিস্, তোদের ত' আর রামায়ণ মহাভারত নাটক নভেল পড়লে চলবে না ভাই, তোদের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।'

অথচ, এমনি মজা যে, সে বছর পরীক্ষায় তাহার দুটি-ভাই-এর মধ্যে একটি ভাইও পাশ করিতে পারিল না, আর শশীশেখর পাশ ত' হইয়াছেই এমন-কি শোনা গেল, সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান বলিয়া স্কুল হইতে সে নাকি দু'দুইটা পুরস্কার পাইবে।

এ খবর সে শুনিতে চায় না, তবু কেমন করিয়া যে সংবাদটা কনক-বরণীর কানে আসিয়া পৌঁছিল কে জানে।

বলিল, 'মরণ আর-কি! পোড়ারমুখো মাষ্টারদের অম্‌নি আক্কেলই বটে! বলেছে হয়ত গিয়ে হাতেপায়ে ধরে'—মা-বাপ-মরা গরীব ছেলে আমি……। মায়ের গয়না চুরি করে' যে বেচ্‌তে পারে তার অসাধ্যি ত' কিছু নেই।'

মেণ্টু কেমন করিয়া না জানি দিদির কথাটা শুনিয়া সেইদিনই ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টায় শশীশেখরের সঙ্গে ভাব করিয়া লইল। বলিল, 'হাঁ শশী, তুই নাকি গয়না চুরি করিস্?'

শশী অবাক্ হইয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'কিসের গয়না? কার? চুরি? কে—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মেণ্টু বলিল, 'বারে, দিদির গয়না চুরি করিস্ নি? দিদি যে বল্‌লে!'

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, 'না।'

বলিল বটে, কিন্তু তাহার ভয় হইতে লাগিল—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাহাদের কোনও কথা হইয়া থাকিবে এবং হয়ত'-বা ইহারই ছুতা ধরিয়া মামীমা তাহাকে প্রহার করিতেও পারেন। সেখানে পিসিমা একবার তাহাকে তাহার মা'র গয়না চুরির অপবাদ দিয়াছে, এখানে হয়ত মামীমা তাহাকে আবার সেই অপবাদ দিয়াই লাঞ্ছনার আর বাকী কিছু রাখিবে না।

এই ভাবিয়া চোখদুইটা তাহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিতেই মেণ্টুর কাছ হইতে সে ছুটিয়া পলাইল।

মেণ্টু অত্যন্ত চালাক ছেলে। ভাবিয়াছিল, এমনি করিয়া ভয় দেখাইয়া শশার সহিত ভাব করিয়া লইয়া কালকার অঙ্কগুলা তাহাকে দিয়াই করাইয়া লইবে, কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন সে সেইখান হইতেই শশীশেখরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'চল্‌ একবার বাড়ী চল্‌, তারপর দিদি আজ দেখ্‌বি তোকে কি করবে!'

ছুটির পর শশীশেখর সেদিন আর বাসায় না ফিরিয়া রেললাইনের ধারে-ধারে সোজা চলিতে লাগিল। খানিকদূর গিয়া সেদিন যে জায়গাটা সে দেখিয়া গিয়াছিল, সেই নির্জ্জন স্থানটায় চুপ করিয়া বসিল। আজ যদি মা তাহার এত দুঃখের পরেও তাহার কাছে আসিয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে জানিবে যে, সব মিথ্যা, হয়—মা তাহাকে আর ভালবাসে না, নয়ত' তাহাকে সে একেবারেই ভুলিয়া গেছে।

এই লইয়া মাকে তাহার ডাকা হইল চারবার, তবু মা তাহার আসে না কেন?

এতদিন পরে সে মনে-মনে জানিল যে, মা তাহার আসিবে না, মরা

মানুষ হয়ত' আর ফিরিয়া আসে না। কিন্তু সে নিষ্ঠুর সত্যস্বীকার করিতে তাহার কষ্ট, হইল ভাবিল, হয়ত' তাহার ভুল হইয়াছে, এরকম করিয়া ডাকিলে হয়ত' আসে না, হয়ত, অন্য কোনও রকমে ডাকিতে হয়।

যাই হোক্, আর সে কোনোদিন মাকে তাহার বিরক্ত করিবে না ভাবিয়া বিষণ্ণমুখে বাসায় যখন ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

ভবেশবাবুর উদ্বেগ আশঙ্কার আর সীমা নাই। শশীশেখর বাড়ী ফিরিতেই তাহাকে কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

ওদিকে পর্দার আড়ালে যে মামীমা দাঁড়াইয়া আছে, শশীশেখর তাহা লক্ষ্য করে নাই। ভিতর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল,' কোথায় ছিল আবার! ওই যে বললাম! ছেলেটিকে তুমি তেমন সাধু মনে কোরো না,—বুঝলে ? শয়তানের একশেষ!'

কোনও জবাব না দিয়া শশীশেখর হাঁ করিয়া রহিল।

মামীমা আবার বলিল, 'জিজ্ঞেস কর না—নিয়েছে কি না। দ্যাখো এখুনি 'না' বলবে।'

ভবেশ তাহার হাতে ধরিয়া টেবিলের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'হাঁরে শশী, তোর মামীর হাত-বাক্স থেকে তুই একটা গিনি চুরি করেছিস্ ?'

শশীশেখর একটা ঢোক্ গিলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বাঁহাত দিয়া পর্দাটা সরাইয়া মামীমা এইবার মুখ বাহির করিল। বলিল, 'কথা বলবার ছিরি দেখ্‌লে ? ও যে নিয়েছে, সে ওর মুখ দেখলেই ত' বুঝতে পারা যায়। তা'ছাড়া মেণ্টুর কাছে ও'ত একরকম বলেইছে।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ রে নিয়েছিস্ ?'

এবারেও শশীশেখর ঘাড় নাড়িল। বলিল, 'না।'

'মেণ্টুর কাছে বলেছিস্ কিছু ?'

'না'।

ভবেশ মেণ্টুর মুখের পানে তাকাইল।

মেণ্টু বলিল, 'জিজ্ঞেস্ করলুম ত', ঘাড় নেড়ে ছুটে পালালো।'

'হাঁরে, পালিয়েছিলি ?'

মা'র দেখা না পাইয়া একে তাহার মন ভাল ছিল না, তাহার উপর এই সব কথার প্যাঁচে পড়িয়া বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া কি যে বলিবে না বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, চোখদুটা আবার জলে ভরিয়া আসিল।

কনকবরণী বলিল, 'থাক্ বাপু, কাজ নেই আর জেরা করে'। আমার জিনিস যখন ওর পকেট থেকেই পাওয়া গেছে আর যে-রকম উল্টো-পাল্টা কথা বলছে, তাতে আর······যাক্, তুমি জেনে রেখো।' আমি একদিন বলেছিলাম ত' হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলে।'

আজ আর ব্যাপারটাকে ভবেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। তাহারও মনে কেমন কেমন যেন একটুখানি সন্দেহের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। হাতখানা তাহার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'যা।'

শশীশেখর চলিয়াও গেল ; কিন্তু মন তাহার এম্‌নি ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল, যে সে রাত্রে সে না পারিল ভাল করিয়া খাইতে না পারিল পড়িতে, না পারিল ঘুমাইতে।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া ক্রমাগত তাহার মাকে মনে পড়িতে লাগিল।

অন্ধকারে চোখ বুজিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া কাহার উদ্দেশে এই নির্বোধ বালক যে তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল তাহা সে নিজেও ঠিক বুঝিতে পারিল না।

পরদিন হইতে দিন যেমন চলিতে থাকে আবার তেম্‌নি চলিতে লাগিল। খাইবার সময়ে আবার তেমনি বিভ্রাট্ ঘটে। কনকবরণী সেণ্টু মেণ্টুকে আলাদা করিয়া খাইতে দেয়, শশীশেখরের উপর আবার তেমনি অত্যাচার চলে।

এসব অত্যাচার তাহার গা-সওয়া হইয়া গেছে।

তবে সেদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিদারুণ।

আলাদা বই-দপ্তর রাখিবার জন্য ভবেশ একদিন বাজার হইতে শশীশেখরের জন্য টিনের ছোট বাক্স আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতেই তাহার যাহা কিছু সবই থাকিত।

সকালে সেদিন কনকবরণী ভবেশকে কাছে পাইয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'ওগো, তোমার সাধের ভাগ্‌নেটি যে বিড়ি টানতে শিখেছে সাবধান কর—নইলে আমার ভাইদুটির মাথা খেয়ে দেবে যে!'

কথাটা ভবেশ প্রথমে বিশ্বাস করিল না। ওইটুকু ছেলে—বিড়ি সিগারেট সে খাইবে কেমন করিয়া! বলিল, 'না, খায় না। খেলে একদিন না একদিন আমার চোখের সুমুখে ধরা পড়ে' যেতো।'

কনকবরণী ডাকিল, 'সেণ্টু!'

সেণ্টু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'কি?'

'নীচে থেকে শশীর বাক্সটা নিয়ে আয় ত' ভাই! ওগো, তুমি যেয়ে

না—দাঁড়াও, আমি কাল স্বচোক্ষে দেখিছি, অন্ধকারে ওই সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ও বিড়ি টানছে। তোমায় ওঠালাম না, তুমি ঘুমোচ্ছিলে।'

ছোট বাক্স। সেণ্টু দুহাত দিয়া তুলিয়া আনিয়া দিদির পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'শশী জানতে পারেনি, জানলার কাছে পিছন ফিরে বসে বসে রামায়ণ পড়ছে আর কাঁদছে।'

কনকবরণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদছে কেন?'

সেণ্টু জবাব দিবার আগেই মেণ্টু বলিয়া উঠিল, 'বা, তুমি জানো না বুঝি? রামায়ণটা পড়লেই ত' ওমনি করে' কাঁদে। ছিচ্-কাঁদুনে' ছেলে কিনা!'

কনকবরণী নিজের চাবি দিয়া বাক্সটা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল; দুইটা চাবি লাগিল না, তিনবারের বেলা একটা চাবি দিয়া ফস্ করিয়া খুলিয়া ফেলিল।

খুলিয়াই দেখে, তাহার কয়েকটি কাপড় জামার নীচেই এক বাণ্ডিল বিড়ি, দুইটা সিগারেট—একটা পোড়া আর একটা আস্ত আর একটি নূতন দিয়াশালাই।

'দ্যাখো, যা বলেছিলাম সত্যি কিনা দ্যাখো।—' বলিয়াই সেগুলা সে বাহির করিয়া ভবেশের পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'সব্বনাশ! সব্বনাশ! একি আমি মাথা খুঁড়ে মরব, না-কী! এই ছেলেকে তুমি বল—ভাল ছেলে!'

ভবেশ এতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেণ্টুকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'ডাক্ ত' ওকে।'

সেই অপেক্ষাই সে করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তড়্‌বড় করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিয়া গিয়া শশীকে উপরে ডাকিয়া আনিল।

মাথার কোঁকড়ানো কালো চুল কপালে আসিয়া পড়িয়াছে, রামায়ণ পড়িয়া সীতার দুঃখে কাঁদিয়া চোখের জল মুছিয়া চোখ দুইটা লাল করিয়া ফেলিয়াছে, পরণের কাপড়খানি একফেরতা গায়ে দিয়া শশীশেখর ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কী এ-সব?'

মামার মুখে এমন কথা সে কোনদিনই শোনে নাই। চোখে তাহার একটি স্নিগ্ধ করুণ মমতার দৃষ্টি সে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছে, আজ সে-দৃষ্টি সহসা এমন রুক্ষভাবে রূপান্তরিত যে কেন হইল তাহা সে প্রথমে ভাল বাহির করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এতগুলা বিড়িই বা আসিল কোথা হইতে, এবং তাহার বাক্সটাই বা হঠাৎ এমন কিসের প্রয়োজনে এখানে আনা হইল তাহাও সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই।

মামীমা বুঝাইয়া দিল, 'বিড়ি খেতে শিখেছ বাবা, সেই কথাই বলা হচ্ছে!'

ঘাড় নাড়িয়া শশীশেখর বলিল, 'না, বিড়ি ত' খাই না।'

কনকবরণী বলিল, 'তবে কি এই বিড়িগুলা আমি তোমার বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছি বলতে চাও?'

শশীশেখর অবাক্ হইয়া গিয়া একবার তাহার খোলা বাক্সের দিকে আর একবার ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত বিড়িগুলার দিকে তাকাইতে লাগিল।

ভবেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঠাস করিয়া তাহার মাথায় একটা চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেখ্‌ছিস কি ষ্টুপিড্, খবরদার বলছি, এ-সব যদি শিখবি ত' খুন করে ফেলব। জানিস্?'

বলিয়া আবার আর-এক চড় মারিয়া বলিল, 'ভেবেছিলাম—ভাল

ছেলে। দিনে দিনে দেখছি গুণ বেরোচ্চে।'

কনকবরণী বলিল, 'বেশ হয়েছে, ওগো আর মেরো না। যাও বাবা, যাও আর কাঁদতে হবে না—যাও, নাটক নভেল কি সব পড়ছ পড়গে।'

ভবেশ আবার রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে মারিবার জন্য হাত তুলিতেই, দয়াময়ী কনকবরণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'থাক, তোমার রাগ ত' জানি। শেষে আবার—'

ভবেশ বলিল, 'ওরে সেণ্ট, নিয়ে আয় ত' ওর রামায়ণখানা! ঠিক বলেছ, রামায়ণও যা, নাটক নভেলও তাই; তাই-বা লুকিয়ে পড়ছে কিনা তাই বা কে জানে!'

সেণ্টু বিদ্যুৎগতিতে রামায়ণখানা আনিয়া ভবেশের হাতে দিল। ভবেশ আর কোনদিক ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাগের মাথায় দুহাত দিয়া বইখানা ধরিয়া পাতাগুলা তাহার পড়্‌পড় করিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগ তখন তাহার এত চড়িয়া গেছে যে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, শতছিন্ন রামায়ণখানি মেঝেতে নামাইয়া নূতন যে দিয়াশালাইটা শশীশেখরের বাক্স হইতে বাহির হইয়াছিল তাহারই একটা কাঠি জ্বালিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিয়া বলিল, 'নে পড় এইবার! ভেবেছিলাম, ভাল ছেলে······না।'

বলিয়া সে দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

রামায়ণখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। শশীশেখর একবার তাহার অশ্রুসজল চক্ষু দুইটী তুলিয়া সেইদিকের পানে তাকাইল। মনে হইল—পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের নীচে টল্‌মল্ করিয়া টলিতেছে। মনে হইল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আগুন ধরিয়াছে।

৪

ধরিত্রী আজ এতদিন পরে শশীশেখরের কাছে নিষ্ঠুর নিরানন্দময় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। যে-মা তাহার মরিয়া গেছে, সে আর আসিবে না। এতদিন সে বৃথাই তাহাকে ডাকিয়াছে। মরে যাহারা, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াই মরে।

ওই একটিমাত্র আশা এবং বিশ্বাসই এতদিন শশীশেখরকে তাহার দুঃখের কথা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, আজ আর তার সে-বিশ্বাস নাই,—মা'র সঙ্গে আর দেখা হইবে না—সে-কথা সত্য। মামীর দেওয়া লাঞ্ছনার কথাটাই তাই আজ শশীশেখরের বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। যে-মামা তাহাকে এতদিন ভালবাসিত, সেও আজ আর তাহাকে ভালবাসে না, রামায়ণখানি সে তাহার নিজের হাতে পুড়াইয়া দিয়াছে। সে-দৃশ্য সে তাহার জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না। মা'র স্মৃতি মধ্যে ওই রামায়ণখানিই ছিল তাহার সম্বল। সে-সম্বল আজ আর নাই। রামায়ণ-খানির পাতায় মা'র আঙুলের ঘামের দাগ লাগিয়াছিল,—সেগুলির উপর কতবার সে চোখ বুজিয়া হাত বুলাইয়া বুলাইয়া মা'র কথা ভাবিয়াছে, আজ আর তাহা'র ধরিবার ছুঁইবার কোনও কিছুই নাই।

শশীশেখরের দিন যেন আর কাটে না। মামীমার অত্যাচার এখনও সমানে চলিতেছে, সেণ্টু মেণ্টু দেখা হইলেই ভেংচি কাটে, তাহাকে দেখিবামাত্র দু'ভাইএ তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, তাহার দিকে

না তাকাইয়া আপনমনেই বলাবলি করে,—'আচ্ছা বল্ ত' দেখি মেণ্টু,—রামায়ণখানা কেমন দাউ দাউ করে' পুড়লো!' মেণ্টু হাসিয়া হাসিয়া একেবারে গড়াইয়া পড়ে, বলে,—'আর সেই কান-মলাটা দাদা, আর সেই ঠাস্ করে' মাথার ওপর…১…'

বলে আর দু'জনেই হাসে।

মামা আর তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। দেখা হইলে আগে যে-মামা তাহার আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া কথা বলিত, সেই মামাই আজ তাহার মুখ ফিরাইয়া যায়।

শশীশেখরের এখানে আর একদণ্ডের জন্য মন টেঁকে না; মনে হয়, এখান হইতে সে চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু কোথায় যাইবে? পিসিমার কাছে গেলে সেও হয়ত আবার তাহাকে এখানেই ধরিয়া আনিবে।

এই সব চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া শশীশেখর মুখ ভারি করিয়া দিবারাত্রি নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায়। রামায়ণখানিও নাই যে, মন খারাপ হইলে তাহাই লইয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া পড়িতে বসিবে। ঘরে যে শশীশেখর বলিয়া আর-একটী ছেলে আছে তাহা আর বুঝিতেই পারা যায় না। খাইবার সময় চোরের মত নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর গিয়া যাহা পায় তাহাই চারটি খাইয়া আসে। সেণ্টু টিট্‌কারি দেয়, সে সব আজকাল সে আর শুনিয়াও শোনে না, মামীমা তিরস্কার করে, শশীশেখর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া শোনে, ইস্কুলে যায়, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া বইগুলি গুছাইয়া রাখিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া উদাস-দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে। সেণ্টু মেণ্টু সরাসর তাহাদের দিদির কাছে গিয়া

খাবার খায়, শশীশেখরের সে অধিকার কোনোদিনই নাই। আগে যদিই বা ভবেশের ভয়ে কনকবরণী তাহাকে যাহাহোক্ কিছু খাইতে দিত, আজকাল আবার তাহাও দেয় না, বেচারা শশীশেখর সেই যে বেলা দশটার আগে চারটি ভাত মুখে দিয়া ইস্কুলে যায় ফিরিয়া যখন আসে ক্ষুধায় তখন তাহার আর জ্ঞান থাকে না, চোখের সুমুখে সব-কিছু যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মনে হয়, উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলে মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠে, তাই কোনো কোনোদিন সে আর জানালার ধারে বসিয়া থাকিতেও পারে না, মেঝেয়-পাতা তক্তাপোষটার উপর শুইয়া মা'র কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে, এমন দিনে তাহার পিসিমার কাছ হইতে একজন বাগ্‌দীর মেয়ে শশীশেখরকে একদিন লইতে আসিল। বলিল, তাহার পিসির নাকি ভারি অসুখ, বাঁচে কিনা সন্দেহ, সুতরাং তাহাকে একবার যাইতে হইবে।

ভবেশ বলিল, 'বেশত,' যাক্ না!'

কণকবরণী ঠোঁট্ উল্টাইয়া বলিল, 'বলিহারি! বেশত', যাক্ না! এম্‌নি না হ'লে তোমার এমন হবে কেন বল? এমন হাঁদা-গঙ্গারাম লোক আমি কখনও দেখিনি।'

ভবেশ ত' অবাক্!

—'কেন গো, কি হলো কি?'

কনকবরণী বলিল,—'তুমি নিজেও যাও। ঠাকুরঝির গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি না হয় গুণধর ভাগ্‌নে খেয়েছে, কিন্তু ও-বুড়ীরও ত' কিছু আছে! বুড়ী যদি মরেই যায়!'

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া ভবেশ হাসিয়া বলিল, 'ও!'

বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'অসুখ হয়েছে, ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছে, ও-ই যাক্, আমি আবার কেন?'

কনকবরণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়। সেই এক কথাই সে বারে বারে বলিতে লাগিল,—'যদি মরে যায় ত' তখন পস্তাতে হবে দেখো।'

ভবেশ অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বলিল, 'মানুষের অসুখ হ'লেই সে মরে না। একান্তই যদি মরে ত' পরে আবার গেলেই চলবে।'

কিন্তু কনকবরণী কিছুতেই বুঝিল না। বলিল,—'হ্যাঁ, যে-ছেলেকে পাঠাচ্ছ, পরে গেলে আবার পাবে নাকি কিছু? তখন কিছু রাখলেই ত'! তার চেয়ে এই সঙ্গেই যাও, যদি ছাখো, ভাল আছে তখন না হয় ফিরে' এসো।'

অগত্যা শশীশেখরকে সঙ্গে লইয়া ভবেশকেই যাইতে হইল।

গিয়া দেখে, কনকবরণীর কথাই ঠিক্। পিসিমার তখন অন্তিম অবস্থা। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, শশীশেখর ও ভবেশকে দেখিয়া বুড়ী প্রথমে চিনিতেই পারিল না, পরে চিনিল যখন, চোখ দিয়া তখন তাহার দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে।

ডাক্তার-কবিরাজ দেখানো হয় নাই, প্রতিবেশী কয়েকজন দয়া করিয়া দেখাশোনা করিতেছিল।

শশীশেখর দেখিল, আবাল্য-পরিচিত তাহার সেই বাড়ী! যেখানে তাহার মা মরিয়াছে, ঠিক সেইখানেই আবার তাহার পিসিমা মরিতেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। ভাবিল,

বুড়া কবিরাজকে একবার ডাকিলে হয়। কিন্তু কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবে, আর কেই বা তাহার টাকা দিবে? ভাবিল, তাহার মা'র মৃত্যুর সময় কবিরাজকে সে ডাকিতে চাহিয়াছিল, এই পিসিমাই তাহাকে ডাকিতে দেয় নাই, আজ তাহার অসুখের সময় সেই-বা কবিরাজকে ডাকিতে যাইবে কেন? কবিরাজের ঔষধ খাইয়া পিসি যদি তাহার সারিয়া ওঠে, তাহা হইলে তাহার আর আফ্‌শোষের বাকি কিছুই থাকিবে না। মনে হইবে, কবিরাজকে ডাকিলে মাও হয়ত' বাঁচিতে পারিত।

কিন্তু তবু কেন না জানি ক্রমাগতই তাহার মনে হইতে লাগিল, বুড়ী পিসিমা তাহার কষ্ট পাইতেছে, আহা, কবিরাজকে একবারটি ডাকিলে হয়!

ভবেশ কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, শশীশেখর ঘন-ঘন তাহার মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। ভয়ে কিছু বলিতে সাহস হইতেছিল না। শেষে অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে মামার আর-একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া মরিয়া হইয়া শশীশেখর বলিল,—'কোব্‌রেজকে ডাকূব?'

বলিয়াই সে মাথাহেঁট করিল।

ভবেশ একবার এদিক-ওদিক তাকাইল। দেখিল, তাহার পশ্চাতে প্রতিবেশী জন-দুই ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। এবং কয়েকটি মেয়ে ঘোম্‌টা টানিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলাবলি করিতেছে।

প্রতিবেশী দুইজন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—'কোব্‌রেজ আব এমন সময়······' বলিয়াই একজন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তার চেয়ে একটু-খানি গঙ্গাজল—'

সমবেত মেয়েদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আনি।'

বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে বোধকরি গঙ্গাজল আনিবার জন্যই নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু গঙ্গার জল যখন আসিল, বুড়ীর তখন সব শেষ হইয়া গেছে। মেয়েটা বাহির হইয়া যাইবার পর হইতেই বুড়ী খাবি খাইতেছিল, তাহার পর অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে মুখখানা বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষু স্থির করিয়া দিল, মরণের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবার চেষ্টা করিয়াও জয়লাভ করিতে পারিল না। বুড়ী মরিল।

শশীশেখর অনেকক্ষণ হইতেই কাঁদিতেছিল। অনেক দিন পরে ভবেশ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'চুপ কর্, কাঁদিস্ নে।'

শশীশেখর যদি বা আপনা হইতেই চুপ করিত, বুড়ী পিসিমার জন্য এত বেশী দুঃখ তাহার হয় নাই, কিন্তু বহুদিন পরে মামার স্নেহের স্পর্শে তাহাকে আরও কাঁদাইয়া দিল। মামার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া শশীশেখর যেন অভিমান করিয়াই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ীর মুখাগ্নি করিল শশীশেখর। শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য আবার তাহারা আসিবে বলিয়া পরদিন সকালে শশীশেখরকে লইয়া ভবেশ তাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

কনকবরণী উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ভবেশ বলিল, 'মরে' গেছে।'

কনকবরণী হাসিয়া বলিল, 'বলেছিলাম না!'

ষ্টেশন হইতে একজন মুটে তাহার মাথার উপর একটা বাক্স লইয়া আসিয়াছিল। কনকবরণী জিজ্ঞাসা করিল, 'ও ক'ার ?'

ভবেশ বলিল,—'বলছি, চল।'

বলিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ভবেশ কহিল, 'ডাকো শশীকে।'

কনকবরণীর মুখের চেহারা হঠাৎ একটুখানি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। বলিল, 'শশীকে কেন ?'

ভবেশ বলিল, 'ছিছি, মিছেমিছি ছেলেটাকে তখন তোমরা সবাই মিলে দোষ দিলে। আমি বলেছিলাম না, বুড়ী-মাগী শয়তানের একশেষ। বুড়ীকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরে' এসে ভাবলাম, দেখি, কি আছে না আছে। বাক্স খুলে' দেখি, সবই রয়েছে, শশীর মা'র গয়নাগাঁটি, টাকা-কড়ি, যা-কিছু ছিল সবই রয়েছে,—অথচ বুড়ী কিনা—ছিছি, তুমিও তাইতে সায় দিয়েছিলে। তুমিও বিশ্বাস করেছিলে।'

অন্য সময় হইলে কনকবরণী কি যে বলিত কে জানে আজ আর সে অতগুলি গহনা টাকাকড়ির নামে মুখে কিছুই বলিল না। বাক্সটার কাছে গিয়া একবার খুলিবাব চেষ্টা করিয়া বারে বারে শুধু জিনিসপত্রগুলি দেখি-বার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভবেশ বলিল, 'থামো, অত তাড়াতাড়ি কেন, তোমার কাছেই ত' সব থাকবে।'

এই কথাটাই সে শুনিতে চাহিতেছিল। শুনিয়া প্রাণপণে তাহার দেখিবার আগ্রহ দমন করিয়া কনকবরণী চলিয়া গেল।

গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল,

'হ্যাগা, ঠাকুরঝির মাথায় চারটে সোনার ফুল ছিল না ?'

ভবেশ বলিল, 'কি জানি বাপু, ফুল-টুল জানিনে,—যা ছিল তাই নিয়ে এসেছি। দেখে মনে হলো—আর বিশেষ কিছু ছিল না।'

কনকবরণী বলিল, 'তাই-বা তুমি জানলে কেমন করে'? তুমি ত' আর দাওনি, দিয়েছিলেন আমার শ্বশুর।'

ভবেশ ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

—'তবে ?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কনকবরণী আবার চলিয়া গেল।

সেদিন খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভবেশের আর নিস্তার রহিল না। বারে বারে শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন—'ঠাকুরঝির ফুল চারটে ছিল। বুঝলে ? আমার যেন মনে হচ্ছে। আর গলায় একগাছা স্থঁৎ-হারও যেন দেখেছিলাম।'

ভবেশ বলে, 'তা' হবে।'

কনকবরণী বলে, 'বা ! হবে কি রকম ! হবে ত' সে-সব গেল কোথায় ?'

গত রাত্রে ভবেশের ভাল ঘুম হয় নাই, স্নান করিয়া আহারাদির পর তাহার ঘুম পাইতেছিল, তেমনি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে জবাব দিল, 'যাবে কোথায় ? আছে—সবই আছে ওই বাক্সের মধ্যে। রাত্রে দেখাব। এখন যাও, একটুখানি—'

বলিয়া সে ঘুমাইবার জন্য চোখ বন্ধ করিল।

কনকবরণী তবু থামিল না বলিল, 'তবে আর ছেলেটাকে সাধু বললে কি হবে ? সে-সব তা'হলে গেল কোথায় ? ওগো—শুনছো ?'

বলিয়া নিদ্রাকাতর স্বামীকে তার খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া

কনকবরণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'খালি ঘুম আর ঘুম! নিষ্কর্মার ধাড়ি গুবে আর কাকে বলেছে! শুনছো?'

সদ্যঘুমন্ত মানুষকে এমন করিয়া বিরক্ত করিলে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ভবেশ রাগিয়া বলিল,—'আঃ! আছে বলছি বাক্সর মধ্যে··· ।'

কনকবরণীও তেমনি জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল, 'না—নেই। নেই বাক্সের মধ্যে।'

ভবেশের ঘুম ছুটিয়া গেল। চোখ খুলিয়া বলিল—'নেই তা' তুমি জানলে কেমন ক'রে?'

কনকবরণী এবার ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, 'দেখলাম। এই যে, এই চাবিটা দিয়ে খোলা গেল।'

বলিয়া সে তাহার আঁচলের খুঁটে-বাঁধা চাবির গোছাটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ভবেশ বলিল, 'ভারি অন্যায় হয়েছে তোমার। ও-জিনিষ শশী-শেখরের, তা জানো?'

স্বামীর ভাব-গতিক ভাল বলিয়া মনে হইল না। গম্ভীরমুখে বলিল, '—জানি।'

ভবেশ বলিল, 'জানো তো খুললে কেন শুনি?'

'কেন, খুলেছি ব'লে কি ফাঁসি শূলি হবে নাকি?'

ভবেশ এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঘুম তখনও তাহার ভাল করিয়া কাটে নাই। হঠাৎ সে ঘুমের ঘোরেই বলিয়া বসিল, 'শশী যদি তোমায় চোর বলে? তুমি যেমন একদিন বলেছিলে সে গিনি চুরি করেছে।'

কনকবরণী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, 'কী! আমি তা'হলে মিছে কথা বলে'ছিলাম? গিনি সে চুরি করে নি?'

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল।

কনকবরণী তাহাকে আবার নাড়া দিয়া বলিল, 'বল! চুপ করে' রইলে যে? চুরি করে নি?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

কনকবরণীর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, সে তাহার চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

শিয়রের কাছে কোনও নারী যদি বসিয়া বসিয়া কাঁদে ত' অতি পাষণ্ডেরও চোখের ঘুম ছুটিয়া যায়।

ভবেশেরও তাহাই হইল। ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিয়া হাত বাড়াইয়া কনকবরণীর কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদছ?'

ঝাঁকানি দিয়া স্বামীর হাতখানা সে তাহার কাঁধ হইতে সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, 'যাঃ-ও।'

ভবেশ ভালমানুষ, কিন্তু বোকা নয়। স্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা তাহার বাড়িল না। কিছুদিন হইতে ভিতরে ভিতরে সবই সে বুঝিতেছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে নাই। এইখানেই তাহার দুর্ব্বলতা। এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কনকবরণীর স্বেচ্ছাচারিতার আর সীমা ছিল না। তাহাও সে জানে।

কিন্তু মানুষের মন। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেই বা কতক্ষণ! একান্ত-স্বার্থপর এই নারীটির বিরুদ্ধে ভবেশের মন সহসা তিক্ত-বিরক্ত

হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল 'কি চাও তুমি? কি করলে তুমি সুখী হও বল ত?'

কনকবরণী জবাব দিল না।

ভবেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল। এবার বেশ জোরে-জোরে। বলিল, 'শশীকে তাড়িয়ে দেবো বাড়ী থেকে?'

কনকবরণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তাই যেন আমি বলছি?'

বলিয়াই আবার কান্না। 'তা' না ত' কী! কী বলছ? কি বলতে চাও?'

কনকবরণী বলিল, 'কিছু না।'

'তার চেয়ে আমি চলে' যাই।'

ভবেশ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, 'যাও।'

কনকবরণী বলিল, 'যাবই ত! তোমার মত শয়তানের ভাত আমি আর খাব না।'

স্ত্রীর মুখে ভবেশ অনেক কথাই শুনিয়াছে, কিন্তু এমন কথা এই প্রথম। বলিল, 'কি বললে? শয়তান?'

ঘাড় নাড়িয়া কনকবরণী বলিল, 'হ্যাঁ।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া গুম্ হইয়া ভবেশ হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

কনকবরণীর কান্নার বেগ বোধকরি এতক্ষণ একটুখানি প্রশমিত হইয়াছিল, বলিল, 'ঢং করে গুণের ভাগ্‌নেকে সেদিন তা'হলে মারলেই বা কেন আর রামায়ণখানা পুড়িয়েই বা দেওয়া হলো কেন, বিশ্বেস যদি করনি?'

কোনও জবাব না দিয়া ভবেশ একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু

এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়েই দৈবক্রমে সুমুখের বারান্দা দিয়া পার হইতেছিল—শশীশেখর।

ভবেশ ডাকিল 'এই শশী, শোন্!'

শশীশেখর বিষণ্ণমুখে কোঁচার খুঁটখানি গায়ে দিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাতের ইসারায় ভবেশ বলিল, 'এগিয়ে আয়!'

শশীশেখর আগাইয়া একেবারে তাহার হাতের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ভবেশ সজোরে তাহার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে না তাকাইয়াই থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি যে বলিবে কিছুতেই সে প্রথমে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পরে বলিল, 'বল্ তুই তোর মামীর গিনি চুরি করেছিলি কি না!'

ভয়ে-ভয়ে শশীশেখর একবার তাহার মামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'না।'

ভবেশ বলিল, 'এখনও—না?'

শশীশেখরের চোখ দুইটা তখন ছল্ ছল্ করিতেছিল। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, 'নিই নি যে!'

ভবেশের রাগ যেন ক্রমশ বাড়ীতে লাগিল। বলিল, 'নিস্‌নি হারাম-জাদা? নিশ্চয় নিয়েছিস।

শশীশেখর আবার বলিল, 'না।'

ভবেশ কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, 'বল্—বল্, পাজি ষ্টুপিড্, বল্ যে, হাঁ নিয়েছি। না নিলেও বল্‌তে হবে তোকে-বল্।'

বলিতে বলিতে ভবেশ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া মুখখানা সহসা লাল হইয়া উঠিল, চোখের কোণে জল দেখা দিল।

কনকবরণী বলিল, 'পাগল হ'লে নাকি ? ছি !'

ভবেশ আবার চেঁচাইয়া উঠিল, 'তুমি চুপ কর।'

বলিয়াই সে আর একবার শশীশেখরের হাতে খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, 'এখনও বল্‌লি নে হতভাগা ! বল্‌ !'

শশীশেখরের মাথার ভিতরটা ঘুরিতেছিল। ব্যাপার কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়াফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়াসজলচক্ষে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল।

ভবেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিমেষের মধ্যে হাত বাড়াইয়া নিজের একপা'ট্‌ চটি জুতা তুলিয়া লইয়া কম্পিত শশীশেখরের মাথার উপর পট্‌ পট্‌ করিয়া সজোরে বসাইয়া দিয়াই সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—'যা বেরো আমার সুমুখ থেকে। বলবিনে ত' বেরো !'

বলিয়াই সে জুতাটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল, তাহার কাপড়ে গেঞ্জিতে কাঁচা রক্তের দাগ !

রক্ত দেখিবামাত্র ভবেশের পাগ্‌লামি ছুটিয়া গেল। শশীশেখরকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গিয়াও ধরিতে পারিল না। টাল্‌ খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে সাম্‌লাইয়া লইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেটা তখন ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভবেশ তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত চটিজুতাটা আবার তুলিয়া লইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার তলাটা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিল, সেখানে একটা ধারালো পেরেক্‌ উঠিয়াছে।

ছি, ছি, রাগের মাথায় এমন করিয়া মারা হয় ত তাহাকে উচিত হয় নাই।

কনকবরণী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ভবেশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিট্‌মিট্‌ করিয়া বলিল, 'হলো ত'? মনস্কামনা পূর্ণ হলো ত' এবার?'

বলিয়াই সে ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া ডাকিল, 'শশী! শশী!'

কোনও সাড়া না পাইয়া সে রেলিংএর গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচে তাকাইয়া দেখিল—শশী নাই।

হয় ত' সে নীচে কোনও ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। ভবেশ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। কিন্তু কোথায় শশী! নীচেব কোনও ঘরেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

সদর দরজায় গিয়া ভবেশ আবার ডাকিল—'শশী!'

শশী সেখানেও নাই।

উন্মাদেব মত ভবেশ এবার খালি পায়েই রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। এ-দিক-ওদিক তাকাইয়া ডাকিল, 'শশী! শশী!'

নরু চাকরটা নীচের একটা ঘরে মেঝের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। বাবুর ডাক শুনিয়া সেও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ভবেশের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেণ্টু মেণ্টু ইস্কুলে গিয়াছে। বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ।

নরুর মুখের পানে তাকাইয়া ভবেশ বলিল 'ছ্যাখ্‌ ত' বাবা—শশী কোথায় গেল ছ্যাখ্‌ত!'

নরু সোজা রাস্তা ধরিয়া ঘুমের ঘোরেই ছুটিয়া চলিল।

ভবেশ রাস্তার মাঝখানে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় রাস্তার দিকের বারান্দার চিক্ ফাঁক করিয়া কনকবরণণী ডাকিল, ‘এসো।’

কথাটা ভবেশ শুনিতে পাইল কি না, কে জানে। দেখা গেল, সে তখন নিবিষ্টমনে তাহার কাপড়ে উপয় কাঁচা রক্তের দাগগুলা পরীক্ষা কবিতেছে আর তাহার চোখ বহিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিয়াছে।

শশীশেখর সেই যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কেহ আর তাহার খোঁজ পাইল না। ভবেশ ভাবিয়াছিল, এখন না আসুক, দু'ঘণ্টা পরে আসিবে। পরেও যখন আসিল না, ভাবিল—দিনের বেলা না হয় যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু রাত্রে? অথচ ভবেশের চোখের সুমুখে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, কিন্তু শশীশেখরের দেখা নাই, খাবাব জায়গা করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে কনকবরণী তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছিল, 'যাই যাই' করিয়া রাত্রি বারোটার পর উঠিল। খাওয়া তাহার একরকম হইল না বলিলেই হয়, কনকবরণীর এত অনুরোধ সত্ত্বেও ভবেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া আবার তাহার সেই নীচের ঘরে গিয়া বসিল। রাত্রে আহারাদির পর নীচে সে বড়-একটা যায় না, দোতলায় তাহার শোবার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে। অন্যদিন হইলে ইহার জন্য কনকবরণী বলিতে তাহাকে আর কিছু বাকী রাখিত না, কিন্তু আজ আর সে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া নরু তাহার নীচের ঘরে দিকে আসিয়াছিল, ভবেশ বলিল,—'যাসনে শোন্!'

নরু সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

ভবেশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খেয়েছিস্?'

নরু বলিল, 'আজ্ঞে না।'

ভবেশ বলিল, 'খেয়ে কি করবি বল্ দেখি?'

নরু একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'খেয়ে ? আজ্ঞে...... এঁটোবাসন-কোসন্ তুলে' রান্নাঘরটা জল দিয়ে ধুয়ে......'

ভবেশ বলিয়া উঠিল, 'ওরে না না হতভাগা, তা জিজ্ঞেস করিনি, তার-পর কি করবি ?'

তাহার পর আর কোনও কাজ তাহার নাই। কি যে জবাব দিবে নরু ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। হতভম্বের মত হাত কচ্লাইতে কচলাইতে 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করিতে লাগিল।

ভবেশের হাতের কাছে কলিকার তামাক পুড়িতেছিল। সেদিকে খেয়াল তাহার নাই। গড়্গড়ার নলটা হাতে লইয়া বলিল, 'ঘুমোবি ত ? ...কোন্ ঘরে ঘুমোস্ ?'

নরু বলিল, 'আজ্ঞে, কোনদিন এই ঘরে, কোমদিন এই পাশের ঘরে।'

ভবেশ বলিল, 'তারপর ? ঘুমোবি ত' ঠিক মরা মানুষের মত, ডেকে ডেকে কেউ যদি মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করে' ফেলে তবু উঠ্বিনে, কেমন ?'

ঘুম তাহার সত্য সত্যই বড় খারাপ, ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না —তাহা সে নিজেও জানে। নরু ঈষৎ হাসিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশ বলিল, 'হাসি নয়, শোন্! আজ তোকে ঘরে শুতে হবে না, দরজার এই পাশটাতে ওই রকের ওপর শুবি।'

বলিয়াই কি যেন ভাবিয়া সে হাত নাড়িয়া আবার কহিল, 'না না শোন্, ওখানে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকালে ত' চলবে না, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর্। সদর দরজার পাশের ঘরটাতেই শুবি। শুবি একেবারে জানালার কোল ঘেঁষে। ডাকলেই সাড়া দিস্ হতভাগা, চট্ করে' উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিস্। ভয়ে ভয়ে শশী আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে'

ত বলিস্—'মামা তোমার কথা কিছু…' বলিয়াই একটা ঢোক্ গিলিয়া কথাটা শেষ করিল,' কিছু বল্‌বে না। তুমি চুপ করে' শোও।'—যা খেয়ে নিগে যা।

বলিয়া নরুকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া ভবেশ তাহার কোঁচার খুঁটে চোখ দুইটা লুকাইয়া মুছিয়া লইয়া গড়গড়ার নলটা টানিতে আরম্ভ করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘরের কাজ সারিয়া নরু কোন্ সময় নীচে নামিয়া আসিয়া মনিবের নির্দ্দেশমত পাশের ঘরের জানালার কাছে শুইয়া পড়িয়াছে।

তামাক খাইতে খাইতে ভবেশ হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সহসা দরজার কাছে খুট্ করিয়া কিসের শব্দ হইতেই ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, শশী?'

দেখে শশী নয়, তাহার স্ত্রী কনকবরণী!

নিঃশব্দে হাতের লণ্ঠনটা মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, আর-একটা লণ্ঠন নিভাইয়া দিয়া তক্তপোষের উপর হইতে গড়গড়াটা সরাইয়া, রাস্তার দিকের খোলা জানালাটা সে বন্ধ করিতে যাইতেছিল, নিষেধ করিল; বলিল, 'থাক, ওটা বন্ধ কোরো না।'

কনকবরণী বলিল, 'ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে?'

ভবেশ বলিল, 'না।'

কনকবরণী তখন ধীরে-ধীরে বাহিরের খোলা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ওঠো একবার, চাদরটা পেতে দিই ভাল ক'রে।'

ভবেশ উঠিল না। বলিল, 'থাক্।'

কনকবরণী সেদিন আর কোনো কথার প্রতিবাদ করিল না। বালিসটা স্বামীর মাথার নীচে দিয়া নিজেও সেই তক্তপোষের একপাশে নিঃশব্দেই শুইয়া পড়িল।

রাত্রির মধ্যে ভবেশ যে এমন কতবার চমকিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। খানিকটা ঘুমাইয়া, খানিকটা জাগিয়া, খানিকটা বা কত রকমের কত বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিটা কোনোরকমে কাটইয়া দিয়া প্রভাতে যখন সে শয্যাত্যাগ করিল, মনে হইল বুকের ভিতর হইতে কিসের যেন একটা গুরুভার ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, বেদনায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ভরিয়া আছে।

উঠিয়াই সে প্রথমে সদর দরজার কাছে গেল। দরজা তেমনিই বন্ধ। খুলিয়া একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার উপর এদিক-ওদিক যতদূর দৃষ্টি যায় তাকাইয়া দেখিল। তাহার পর ঘরে আসিয়া প্রত্যেকটি ঘর ভাল করিয়া দেখিয়া স্নানের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

স্নান করিয়া চা খাইয়া জামাজুতা পরিয়া ভবেশ বাহির হইয়া যাইতেছিল, কনকবরণী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায়'?

ভবেশ বলিল, 'আসি।'

'আসি' বলিয়া সেই যে সে বাহির হইয়া গেল, সারাদিনের পর বাড়ী ফিরিল রাত্রে।

মুখের চেহারা দেখিয়া কনকবরণী কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। জুতা-জামা খুলিয়া ভবেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই বলিল 'নাঃ, সেখানেও যায় নি।'

এতক্ষণে কনকবরণী কথা বলিতে সাহস করিল। বলিল, 'পিসি থাক্‌লেও বা যেতো। এখন আর কার কাছে যাবে সেখানে?'

ভবেশ মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, 'তবে সে গেল কোথায়?'

কনকবরণী বলিল, 'ফিরে সে আসবে নিশ্চয়।'

চুপ করিয়া খানিক্ ভাবিয়া ভবেশ বলিল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

কিন্তু মনের আশা তাহাদের মনেই রহিয়া গেল।

অনুসন্ধানের ত্রুটি ভবেশ করে নাই। পুলিশে খবর দিয়াছে। খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে। ফটো থাকিলে বোধহয় তাহাও ছাপিয়া দিত।

শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না।

শশীশেখর নিরুদ্দেশ!

খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ভবেশের চোখের সুমুখে শুধু সেই ছবিখানি ফুটিয়া ওঠে।—গায়ে একখানি গেঞ্জির 'উপর পরনের কাপড়খানি জড়ানো, খালি পা, শুষ্ক ম্লান মুখ, কপালের উপর মাথার কোঁকড়ানো কালো চুলগুলি আসিয়া পড়িয়াছে···!

কখনও মনে হয়, হেঁটমুখে সজলচক্ষে সে দাঁড়াইয়া, আর তাহার চোখের সম্মুখে রামায়ণের কয়েকটি ছিন্ন পত্রে ধূ ধূ করিয়া আগুন ধরিয়াছে!

কখনও বা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বালক কাঁদিতে কাঁদিতে হয় কোন্ রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে,—কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই, করুণা করিয়া কেহ তাহাকে ডাকিয়া হয় ত দু'টা কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই!

কিম্বা হয়ত' কোনও গৃহস্বামী দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু করুণাময়ী স্ত্রী তাহার এ বদান্যতা সহ্য করিতে পারে না। চোর অপবাদ দিযা মারিয়া হয়ত তাহাকে আবার তাড়াইযা দিয়াছে। শশীশেখরের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের দাগ!...

ভবেশ শশীশেখরের খোঁজ পাইল না।

কিন্তু আমাদের সে খোঁজ রাখিতে হইয়াছে। না রাখিলে এইখানেই াল্পের যবনিকা টানিয়া দিতে হইত।

নরু যখন তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল, শশীশেখর তখন সেখান ্হইতে বহুদূরে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা সে রেলষ্টেশনে চলিয়া যায়। াাইবামাত্র দেখে, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মেব উপব একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দাঁড়াইয়া াাছে। শশীশেখর আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহারই একটি ়ামরার একপার্শে চুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ়াড়িয়া দেয়।

প্রত্যেক ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীখানা একবার করিয়া দাঁড়ায়। শশী-শেখরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। এখনই হয়ত কেহ আসিয়া তাহার কাছে টিকিট চাহিয়া বসিবে, না দিতে পারিলেই গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবে।

কিন্তু ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে গাড়ী বহুদূর চলিয়া আসিল, টিকিট তাহার কাছে কেহই চাহিল না। জানালার কাছটিতে মুখ ...িয়া শশীশেখর বাহিরের পানে তাকাইযাছিল। বেলা ক্রমশঃ পড়িয়া ...াতেছে। লাইনের দুই পা, কোথাও-বা দিগন্ত-বিস্তৃত শুক্‌নো ধানের

মাঠ, কোথাও-বা ছোট ছোট গ্রাম! গরুর পাল লইয়া রাখাল-বালক গ্রামে ফিরিতেছে। লাইনের ধারের পুষ্করিণীতে গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া জল লইতে আসিয়াছে। কয়েকটি মেয়ে পুকুরের পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ট্রেণ দেখিতেছে। শশীশেখরের মনে হইতে ছিল, গাছে-ঢাকা ছোট্ট ঐ গ্রামে যদি তাহার বাড়ী হইত, আর সে যদি এমনি বহু দূর দেশে চাকুরি করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার মা'ও অমনি পুকুরের জলে কলসী ভাসাইয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয় পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইত, গাড়ী হইতে হাত নাড়াইয়া সেও জানাইয়া দিত যে, সে এই গাড়ীতেই চলিয়াছে।

মা'র কথা মনে পড়িতেই শশীশেখরের মনে হইল, সে একা তাহার মা নাই, বাবা নাই, ভাই নাই, বোন্ নাই, আত্মীয়স্বজন গৃহসংসার— কেহ কোথাও নাই। এত বড় এই বিরাট্ পৃথিবীর মধ্যে এমন একটিও মানুষ নাই, যে তাহাকে স্নেহ করে। শুষ্ক নীরস কঠিন এই পাষাণী ধরিত্রীর উপর আজ সে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় চলিয়াছে জানে না, এম্‌নি করিয়াই না জানি তাহাকে তাহার সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলিতে হইবে। কত নিষ্ঠুর অভিশাপ যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কে জানে! ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাহিরের কোনও বস্তুই তখন আর ভাল করিয়া দেখা যায় না। গাড়ীর ভিতর আলো জ্বলিয়াছে। সারা রাত্রি ধরিয়াই গাড়ীটা যদি চলে ত' বড় ভাল হয়। সকালে সে গাড়ী হইতে নামিবে। তাহার পর কি করিবে জানে না।

তাহার পাশেই একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বসিয়াছিল। বয়স

বোধকরি তাহার মামার চেয়েও কিছু বেশী। শশীশেখরকে হাতের ইসারা করিয়া বলিল, 'এই! হঠো হঠো, জেরা হঠ্‌ যাও উধার্‌!'

শশীশেখর একটু সরিয়া বসিল।

মাথার উপরের 'বাঙ্ক' হইতে লোকটা একটা 'টিফিন্‌ ক্যারিয়ার্‌' নামাইয়া বেঞ্চের উপর বেশ করিয়া চাপিয়া বসিয়া এলুমেনিয়ামের বাটী-গুলি বাহির করিয়া খাবার খাইতে লাগিল। খাইবার সে কী অপরূপ ভঙ্গী! একখানি করিয়া লুচি তুলিয়া লয়, বেশ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লোলুপদৃষ্টিতে বার-কতক দেখে তাহার পর হাত দিয়া ভাঁজ করিয়া প্রকাণ্ড বড় তাহার মুখের 'ছাঁ'র ভিতর লুচিটি ঢুকাইয়া দিয়াই একটি একটি করিয়া ভাজা আলু মুখের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিতে থাকে, আর মনের আনন্দে পা নাচাইতে নাচাইতে এদিক-ওদিক তাকায়।

চোখের সুমুখে তাহার এই খাওয়া দেখিয়া শশীশেখরের মনে পড়িল, কখন্‌ সেই বেলা দশটার সময় চারটিখানি ভাত সে খাইয়াছে, তাহারপর এই এখনও পর্য্যন্ত একটু জলও সে খায় নাই। এতক্ষণ সেকথা ভুলিয়াই ছিল। এইবার যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে।

কিন্তু সেকথা ভাবা বৃথা। সঙ্গে একটি পয়সাও নাই যে, কিছু কিনিয়া খাইবে!

শশীশেখর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ীটা যে-ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল প্রকাণ্ড ষ্টেশন। চারিদিকে আলো, ফিরিওয়ালাদের চীৎকার, কতরকমের কত খাবার মাথায় লইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,

কত যাত্রী উঠিতেছে, নামিতেছে;—শশীশেখর ম্লানমুখে সেইখানেই চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। একবার ভাবিল, এইখানেই নামিয়া পরে ; আবার ভাবিল, না, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, রাত্রে নামিয়া কাজ নাই, একেবারে সকাল হইলেই নামিবে। হিন্দুস্থানী লোকটির খাওয়া তখন শেষ হইয়াছে। বাটির অবশিষ্ট লুচি-তরকারি সে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেইখান হইতেই ডাকিতে লাগিল, 'পানি-পাঁড়ে! পানি পাঁড়ে।'

কোথা হইতে দুইটা হ্যাংলা কুকুর ছুটিয়া আসিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত লুচি কয়খানি লইয়া খাওয়া-খাওয়ি সুরু করিয়া দিল। রুগ্ন কঙ্কালসার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ট্রেণে যাত্রীদের কাছে বোধকরি ভিক্ষা করিতেছিল, কুকুরের মুখে অতগুলি খাবার দেখিয়া তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, দু'জনেই একসঙ্গে ছুটিয়া আসিতে গিয়া কুকুরের গায়ে হোঁচট্‌ খাইল কি ছেলেটা ঠেলিয়া দিল কে জানে, মেয়েটি খানিক্‌ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া টাল্‌ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সর্ব্বৎ-ওয়ালার চাকা-দেওয়া ঠেলা-গাড়ীটায় ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, আর ঠিক সেই অবসরে ছেলেটা হাত বাড়াইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত কুকুরদুইটার মুখ হইতে লুচি কয়খানি একরকম জোর করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া অন্যদিক্‌ দিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। মেয়েটাও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিছন ধরিল,—'আমাকেও একটু দে রতন!'

পানি-পাঁড়ে জল দিতে আসিয়াছিল। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জানালার বাহিরে দুইটি হাত বাড়াইয়া তাহারই উপর জল লইয়া আল্‌গোছা ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া খাইতে লাগিল।

শশীশেখরের কেমন লজ্জা কবিতেছিল। তবু সে তাহার সেই ছোট ছোট হাতদুইটি জানালার বাহিরে বাড়াইযা অঞ্জলি পাতিয়া বলিল, 'জল খ।ব !'

পানি-পাঁড়ে তাহার সেই কলাই-কবা গেলাস দিয়া শশীশেখরের হাতেব উপর জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, 'পিও।'

কিন্তু হাতের উপব মুখ রাখিয়া আল্‌গোছে কেমন কবিয়া পান করিতে হয় তাহা সে জানে না। অঞ্জলি-ভর্ত্তি জলটুকু মুখেব কাছে আনিয়া পান কবিতে গিয়া দেখে, আঙ্গুলেব ফাঁক দিযা সমস্ত জলটুকুই মাটিতে পড়িযা গেল তাহাতে তাহাব শুষ্ককণ্ঠ ভিজিল কিনা সন্দেহ।

জলেব জন্য শশীশেখব আবার হাত পাতিল। পানি-পাঁড়েও আবাব তাহাব বাল্‌তি হইতে গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া তাহাব সেই প্রসারিত অঞ্জলিপুটে জলও একটুখানি ঢালিযা দিল ; কিন্তু শশীশেখবেব দুর্ভাগ্য. বাঁশী বাজাইয়া হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ী তখন চলিতে আবম্ভ করিযাছে।

৬

কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিছুই বুঝিতে পারে নাই, ঝাড়ুওয়ালারা গাড়ী পরিষ্কার করিতে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দিল।

শশীশেখর অবাক্!

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যাত্রীরা কেহ আর গাড়ীতে নাই, মোটপোঁটলা ছেলেমেয়ে লইয়া দু'একজন মাত্র প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া তখনও ঘোড়ার গাড়ীর দালালদের সঙ্গে বচসা করিতেছে। প্রকাণ্ড ষ্টেশন, গাড়ীখানা যেন একটা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছে। শশীশেখর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কল্‌কাতা?'

ঝাড়ুদার একজন বলিল, 'হব্‌ড়া টীশন—উতার যাইয়ে।'

ভয়ে ভয়ে শশীশেখর গাড়ী হইতে নামিয়া একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ফটক পার হইয়া প্রকাণ্ড ষ্টেশনের ভিতর দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুমুখে গঙ্গা। পুলের উপর অসংখ্য যান-বাহন এবং লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এই কর্ম্মকোলাহলময় জনবহুল মহানগরীর কোথায় তাহার স্থান কিছুই সে জানে না, তবু সে পুলের উপর লোকজনের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণে মনে হইল—টিকিট তাহার কাছে কেহ চাহে নাই। মনে হইল, মা তাহার নিজে আসিয়া দেখা দিতে হয়ত' পারে না; কিন্তু

অলক্ষ্যে থাকিয়া নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত বিপদ্-আপদ্, সমস্ত অকল্যাণ হইতে তাহাকে রক্ষা করে।

সোজা চলিতে চলিতে শশীশেখর দেখিল, একটা রাস্তার ধারে পাগ্‌ড়ি-ওয়ালা একজন লোক টিনের তৈরী লম্বা একটা চোঙার মুখে জল ঢালিয়া দিতেছে, আর তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা অঞ্জলি পাতিয়া তাহাই পান করিয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

পিপাসার্ত্ত শশীশেখর চুপ্ করিয়া সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। যে-লোকটি জল দিতেছিল, সে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কতকগুলি ভিজা ছোলা ও খানিকটা গুড় তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'খা- লেও বেটা।'

এই অযাচিত অনুগ্রহে শশীশেখরের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল, চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

তাহার পর গুড় ছোলা আর জল খাইয়া সে সেই যে পথে পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, সন্ধ্যার পুর্ব্বে দেখা গেল, তখনও সে তেমনি ঘুরিতেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শশীশেখর তখন টলিতেছে, পায়ে যেন আর জোর নাই। পথে পথে এমন করিয়া আর কতক্ষণই বা ঘুরিবে! না খাইয়া এইবার শরীর তাহার অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। শশীশেখর ভাবিল, এম্‌নি করিয়া আর দু দিন যদি সে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে তিন দিনের দিন হয়ত সে আর চলিতে পারিবে না। চারদিনের দিন হয়ত সে এই ফুটপাতের উপরেই পড়িয়া থাকিবে। পাঁচ দিনের দিন মরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই মৃত্যুর কথা ভাবিতে গিয়া তাহার মনে হইল, না না

তাহাকে কিছুতেই মরিতে দিবে না। মা'র অদৃশ্য স্নেহ এবং করুণা তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া তাহাকে রাখিবেই, এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস '

এমনি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে শশীশেখর হঠাৎ এক-সময়ে দেখিল, পথের ধারে একটা দোকানের সুমুখে অনেক-গুলা লোকের ভিড় জমিয়াছে।

মস্ত বড় একটা কাপড়ের দোকানের ভিতর গ্রামোফোন বাজিতেছে, আর তাহাই শুনিবার জন্য এত লোক !

গান শুনিবার জন্য জনতার এক পাশে শশীশেখরও চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ সেই জনতার মধ্যে 'চোর' 'চোর' লিয়া একটা চীৎকার উঠিতেই লোকগুলা সব এদিক্ ওদিক্ একটুখানি সরিয়া গেল। কে যেন কাহার পকেট কাটিয়া টাকা চুরি করিয়াছে !

দেখা গেল, দোকানের আলোর সুমুখে একজন ভদ্রলোক তাঁহার কাটা পকেটে হাত চালাইয়া কি কি বস্তু তাঁহার চুরি িয়াছে কাঁদ-কাঁদ মুখে তাহাই বলিতেছেন আর কয়েকজন শ্রোতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া শুনিতেছে।

গ্রামোফোন বন্ধ হইযা গেছে। শ্রোতারা তখন চোর লইয়া ব্যস্ত !

কেহ প্রশ্ন করিতেছে,—'ধরতে পারলেন না মশাই ? আচ্ছা বোকা ত' আপনি……'

আবার কেহ বলিতেছে,—'পাকা হাত মশাই ওদের, কোন্ সময় যে চুরি করে কিছু বুঝবার উপায় নাই।'

'চোর আর যাবে কোথায় মশাই? আছে নিশ্চয়ই এরই মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে।'

'ঠিক বলেছেন দাদা, চোর অনেক সময় ভিড়ের মাঝখানেই সাধু সেজে দাঁড়িয়ে থাকে।'

দোকানের 'শো-কেস্'টার পাশে চুপ করিয়া নিতান্ত নিরীহের মত শশীশেখর দাঁড়াইয়াছিল। একটা লোক পট্ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তুমি কে হে?'

শশীশেখরের মুখখানি তখন তাকাইয়া এতটুক্ হইয়া গেছে। কি যে বলিবে কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নিতান্ত করুণ দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

লোকেরা একটা হুজুগ পাইলে হয়। সকলেই যেন তাহার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

'বাড়ী কোথায় রে, কি, নাম তোর?'

কে একজন মাথায় তাহার এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'কথা বলিস্ না কেন, বোকা নাকি?'

'এই বয়সেই পকেট মার্তে শিখেছ বাবা?'

বলিয়া আর এক ব্যক্তি আগাইয়া আসিয়া তাহার গেঞ্জিটা তুলিয়া এদিক্ ওদিক্ নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিল। বলিল, 'কাঁচিটা কোথায় চালান করে' দিলে বাবা এরই মধ্যে? সঙ্গে আরও সাক্‌রেদ্ ছিল বুঝি?'

ব্যাপার দেখিয়া আশ-পাশের দোকানীরাও তখন ছুটিয়া আসিয়াছে। শশীশেখরের ম্লান মুখখানি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজনের বোধকরি

দয়া হইল। বলিলেন, 'পাগল হয়েছেন মশাই? চোর এতক্ষণ পালিয়েছে। দেখছেন না—ছেলেমানুষ, ভদ্দরলোকের ছেলে······'

'তাই হবে। যা বাড়ী যা, ভাগ্।' বলিয়া যে-লোকটা শশীশেখরকে সন্দেহ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আগাইয়া আসিয়াছিল সে-ই সকলের আগে চলিয়া গেল।

শশীশেখরের চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছিল। কি যেন সে বলিতেও চাহিল; কিন্তু ঠোঁট দুইটি তাহাব অসম্ভব রকম কাঁপিয়া উঠিতেই বলা তাহার আর হইল না, দর্ দর্ করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া আসিল মাত্র।

কিন্তু একজন চলিযা গেলেও সেখানে লোকের অভাব ছিল না। একজন অম্নি বলিয়া উঠিল,—

'এঁঃ, আবার কান্না হ্যাখো! দাও হে একটা পুলিশ ডেকে দাও ত'—কান্না ওর আমি বার কর্‌ছি।' বলিয়া বোধকরি পুলিশের জন্যই সে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছে, এমন সময়ে দুই হাত দিয়া ভিড় ঠেলিয়া কালো কিস্তুতকিমাকার মোটা সোটা একটা লোক পান চিবাইতে চিবাইতে শশীশেখরের কাছে আসিয়া টপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, 'আয়!'

'আয়' বলিয়াই সে আর কাহারও দিকে না তাকাইয়া শশীশেখরকে টানিতে টানিতে আবার তেমনি ভিড় ঠেলিয়া দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া বলিল, 'বোস্।'

শশীশেখর অবাক্!

লোকগুলাও তখন হাঁ করিয়া সেই দিক পানে তাকাইয়া আছে।

ছেলেটাকে সে কেমন করিয়া মারে তাহাই দেখিবার জন্য কয়েকজন লোক তাহার পিছু পিছু হুড়্মুড়্ করিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিতে যাইতেছিল, মোটা লোকটি হাতজোড় করিয়া নিষেধ করিল,—'দোহাই আপনাদের! দোকানে ঢুক্‌বেন না,—ওইখান থেকেই বাড়ী যান।'

দোকানের মালিক বোধকরি তিনি নিজেই। বলিলেন, 'ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে টানাটানি কর্‌ছেন,—লজ্জা করে না?'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান গুর্খা দরোয়ানটাকে হুকুম করিলেন,—

'তাড়িয়ে দাও সব এখান থেকে। কেউ যেন গোলমাল না করে।'

বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। লোকগুলা তখন আপনা হইতেই সরিতে আরম্ভ করিযাছে।

যাহার চুরি গিয়াছে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশীশেখরের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিয়া গেল,—'তিনটে টাকা ছিল মণি-ব্যাগে। খা ব্যাটা কত খাবি!'

শশীশেখরের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

দোকানের মালিকের নাম মাখন সান্যাল। দেখিতে কদাকার, গায়ের রং কালো, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, বড় বড় গোঁফ্, পাক খাইয়া খাইয়া মুখের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, দেহের সর্ব্বত্র ভাল্লুকের মত লোমে ঢাকা।

বাড়ী তাঁহার বেশি দূরে নয়। পাশের একটা গলির ভিতর দোতলা একখানি বাড়ী। বাড়ীখানি নিজের। সংসারে লোক বলিতে তাঁহার বুড়ী মা, স্ত্রী এবং এক অবিবাহিতা কন্যা। পুত্রসন্তান

নাই, এবং সেইজন্যই বোধ করি এই ছেলেটার উপর নির্য্যাতন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিন হইতে তাঁহারই সংসারে শশীশেখরের একটুখানি স্থান হইয়াছে।

শশীশেখর তাঁহারই বাড়ীতে দু'বেলা খায় আর দোকানে কাজ করে।

কাজ এমন বিশেষ কিছুই নয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গিয়া কাঠের মাচানের উপর বসিয়া থাকিতে হয়।

নীচে বসিয়া বসিয়া যাহারা কাপড় বিক্রি করে, তাহারা হাঁকে হয়ত' —'ল' চুড়ি পাড়, কালোর ধাক্কা, সাত শ, নিরানব্বই!'

কাপড়টা বাহির করিয়া মাচানের উপর হইতে নম্বর দেখিয়া ঠিক সেই লোকটার হাতের কাছে কাপড়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

শিখিতে মোটেই দেরী হয় না। কোথায় কি কাপড় আছে, কোন্ কাপড়ের কি নাম, দু'দিনেই সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

মাখনবাবু বসিয়া বসিয়া দেখেন আর বলেন, 'ছোঁড়াটা খুব কাজের লোক হবে দেখ্‌ছি,—না কি বল হে জিতু?'

জিতু তাহার মুখখানা কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া বলে, 'নাঃ, ও আপনি বসে' রয়েছেন বলে'। নইলে দশটা ডাকে সাড়া দেয় না।'

আর একজন খাতা লিখিতে লিখিতে হুঁকা টানিতেছিল, বলিল, কি যে একখানা বই পেয়েছে মশাই সেখানা পড়্‌ছে ত' পড়্‌ছেই।'

উপরের দিকে তাকাইয়া সান্যাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বই রে? রে ও ছোঁড়া!'

শশীশেখরেরই বয়সী একটা ছেলে ঠিক বাঁশীর মত কণ্ঠস্বরে উপর হইতে জবাব দিল, 'ফাষ্টোবুক্ !'

'ফাষ্টোবুক্ ! কই দেখি, নিয়ে আয় দেখি বইখানা, ওরে ও শশী' বলিয়া মাখন সান্যাল তাহার হাতের ইসারায় শশীকে নীচে নামিবার ইঙ্গিত করিলেন।

বইখানা হাতে লইয়া শশীশেখর নীচে নামিয়া আসিল।

দেখা গেল, বইখানি 'ফাষ্টবুক' নয়, ছবিওয়ালা একখানি ইংরাজি বই। বইখানি উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'এ বই কোথায় পেলি বে তুই ?'

ভয়ে ভয়ে শশীশেখর বলিল,—'দিদিমণির কাছে।'

'এ বই তুই পড়তে পারিস ? কোথাও আট্‌কায় না ?'

শশীশেখর বলিল, 'না।'

সান্যাল বলিলেন, 'হুঁ, 'ফাষ্টোবুক' তাহ'লে পড়তে পারিস তুই ?'

শশীশেখর বলিল, 'এটা ফাষ্টবুক ত'নয়—এটা রবিনসন্ ক্রুশো।'

সে আবার কি। তবে যে ওই ছোঁড়া বল্‌লে ফাষ্টোবুক্ !'

'না। ফাষ্টবুক্ আমার অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে।'

সান্যাল বলিলেন, 'তাহ'লে তুই অমলার সমান সমান পড়িস্ বল্ !'

অমলা তাঁহাব মেয়ের নাম। গাড়ী করিয়া সে স্কুলে পড়িতে যায়।

শশীশেখর বলিল, 'দিদিমণির চেয়েও এক ক্লাস উঁচুতে পড়তাম আমি। এ বইখানা দিদিমণিই আমাকে দিয়েছে।'

সান্যাল বলিলেন, 'হুঁ। অমলা খুব ভালো ইংরিজী পড়ে। বুঝলে জিতু, অমলা—আমার বড় মেয়েটা হে, স্কুলে ফাষ্টো হচ্ছে বরাবর।

বুঝলে ? মাষ্টারনীরা ভারি ভালবাসে—পুরস্কার পেয়ে পেয়ে ঘর বোঝাই করে' ফেলেছে । আমার মা বলে—মেয়েকে পড়াতে হবে না, সেকেলে লোক কিনা ! আমার কিন্তু বাবা সেই এক জিদ্। ওকে আমি পড়াবই। বিয়ে আমি এখন ওর দিচ্ছি নে। বুঝলে ?'

এই বলিয়াই তিনি তাহার কর্ম্মচারী জিতুর সঙ্গে কন্যা অমলার গল্পে এম্‌নি মশ্‌গুল্ হইয়া পড়িলেন, যে শশীশেখর যে কাছে দাঁড়াইয়া আছে সেদিকে তাঁহার আর খেয়ালই রহিল না। ·

এতক্ষণ পরে কাপড়ের একজন খরিদ্দার আসিতেই বইখানা তিনি শশীর হাতে ফিরিয়া দিয়া গল্প বন্ধ করিয়া বলিলেন, 'যা পড়্‌গে যা বসে' বসে'।'

খুশী হইয়া শশীশেখর আবার তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উঠিল।

কোন্ দিক্ দিয়া কি যে হয় কিছুই বলা যায় না। সেইদিনই বাড়ী গিয়া সান্যাল-মশাই ডাকিলেন, 'ওরে ও অমলা, শোন্ !'

অমলা তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কি বলছ বাবা ?'

'হাঁরে ওই শশী শুনছি নাকি ইংরিজী পড়তে পারে।'

অমলা হাসিয়া বলিল, 'থার্ডক্লাসে পড়্‌তো যে !'

সান্যাল বলিলেন, 'বটে ! তাহ'লে তোর চেয়ে নীচে—বল ।'

অমলা বলিল, 'না বাবা, আমার চেয়ে ওপরে।'

সান্যাল মশাই বলিলেন,' বিদ্যা দানের ওপরে আর দান নেই — জানিস্ অমলা ! ছেলেটা বামুনের ছেলে, ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিই—না কি বল্ ! ডাক্ দেখি তোর মাকে।'

মাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। সান্যালগৃহিণী পাশের ঘরেই ছিলেন। সাদা ধপ ধপে গায়ের রং, যেমন রোগা তেমনি লম্বা, চোখে রূপার-বাঁধানো চশমা,—ঝঙ্কার দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন,—

'কেন গো, বলেছি না, যেদিন এসেছে সেইদিনই ত' বলেছি,—দাও স্কুলে ভর্ত্তি করে' দাও, বামুনের ছেলে ধর্ম্ম পুণ্যি হবে ; তা ধর্ম্ম পুণ্যিতে কি মন আছে তোমার, তুমি শুধু আছ—কা'র গলায় ছুরি দেবে --একটাকার কাপড় পাঁচ টাকায় বিক্রি করবে,……নরুকে কোথাকার। খাবে নরকে হাবুডুবু, তখন বল্‌বে যে হ্যাঁ, বলেছি বটে!'

'সেই ভালো।'

পরদিন নরকের ভয়েই বোধকবি সান্যাল মহাশয় জামাজুতা পরিয়া হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি লইয়া গাড়ী চড়িয়া শশীশেখরকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। এবং তাহার পর হইতে শশীশেখরও অমলার সঙ্গে আহারাদি করিয়া কাপড়ের দোকানে না যাইয়া স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল।

সান্যাল-গিন্নী ডাকেন, 'ওরে শশী, আয় বাবা আয় খেয়ে নিবি আয়! বামুনের ছেলে—না খেয়ে খেযে শেষে আমার নরকের ব্যবস্থা করে' দিস না বাবা আয়।'

আসিবে কি, সে তখন অমলার সঙ্গে কত দেশ-বিদেশের কত মজার মজার গল্প করিতেছে!

শশী বলিল, 'মা ডাকছে যে! চলো।'

অমলা তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে। বলে, 'চুপ্‌! আরও ডাকুক। ডেকে ডেকে যখন গালাগালি দেবে তখন যাব।'

গালাগালি দিতে তার বিশেষ দেরি হয় না। বার কতক ডাকিয়াও যখন সাড়া পান না, তখন সুরু করেন, 'হাজার হোক্ পরের ছেলে ত'! ওই কাপুড়ে মিন্সেই যত নষ্টের মূল। কেন বাপু, পরের গলায় ছুরি দিয়ে পরকালের পথ ঝর্‌ঝরে কর্‌ছ তাই কর, আবার এই বামুনের ছেলেটিকে ঘরে এনে পাপের বোঝা বাড়াবার দরকার কি! কখন্ কি অপরাধ হয়—হে ঠাকুর অপরাধ নিয়ো না বাবা!'

বলিয়া যুক্তকরে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার তাঁহার মেয়েকে লইয়া পড়েন।

'বলি ও অমলা, কত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, বাপ্ না হয় জুতামোজা পরিয়ে খিরিস্তানী করবার মতলবে আছে, তাই বলে' কি সময়ে চারটে খেতেও হবে না ছাই! নিজেও খাবি না আর ওই ছেলেটাকেও খেতে দিবি না?'

এইবার তাহারা দু'জনেই হাসিতে হাসিতে মা'র্ কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। শশীশেখর বলে, 'আমার কিছু দোষ নেই মা, এই অমলা আমায় আসতে দেয় নি।'

হাসিতে হাসিতে অমলা বলে, 'খবদার বলছি, শশী মিছে কথা বোলো না! না-মা, ওই শশীই বরং বল্‌ছিল—মা'র গালাগালি বড় ভাল লাগে।'

সান্যাল-গৃহিণী বলেন, 'হ্যাঁ তা লাগ্‌বে বই-কি বাছা, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাই আর তোমরা দিব্যি······নিজের মা হ'লে এতক্ষণ ঠ্যাঙ্গাতো তোমায়, তা জানো!'

নিজের মা'র কথায় শশীশেখরের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসে এবং তাহাই সে গোপন করিবার জন্য জানালার কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। একে রাত্রিকাল, সান্যাল-গিন্নী চোখে ভাল দেখিতে

পান না, সেজন্য চিন্তা নাই, কিন্তু অমলার চোখ বড় তীক্ষ্ণ। তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া ওঠে, 'মা আমাদের বড় ভুলে যায় বাপু, কিছু মনে থাকে না। বলেছি হাজারবার তুমি ওর মা'র কথা বোলো না, বললেই কাঁদে, তবু সে কিছুতে……কই দেখি—!' বলিয়া অমলা শশীশেখরের কাছে গিয়া দুইহাত দিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইয়া সত্যই সে কাঁদিতেছে কিনা দেখিতে চায়।

শশীশেখর বলে, 'ধেৎ! কাঁদব কেন।'

বলিয়াই সে হাত দুইটা সরাইয়া দিয়া ম্লানমুখে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসি দিয়া অশ্রু ঢাকানো বড় দায়। ধরা পড়িয়া গিয়া শেষে হাতের ইসারায় অমলাকে চুপ করিতে বলিয়া, কাপড় দিয়া চোখ দুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলে, 'কাঁদ্‌বে কেন? চোখে একটা—'

'মাছি ঢুকেছিল না?' বলিয়া অমলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলে, 'ছিঁচ্‌কাঁদুনে!'

সান্যাল-গৃহিণী খাবার ধরিয়া দিয়া শশীশেখরকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলেন, 'না না কাঁদে নি, তুইও যেমন। কেন রে শশী, ছি. কাঁদতে আছে? আমি যেমন অমলার মা, তোরও তেমনি মা হই শশী, তোর কিছু ভাবনা নেই, কাঁদিসনে। আমার ছেলে নেই, তুই-ই আমার ছেলে।'

শশীর কান্না ইহাতে থামা দূরে যাক্, আরও যেন বেশী করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে যায়।

প্রাণপণে তাহা সে দমন করিয়া এম্‌নি আর একজনের কথা ভাবে।

সন্তান ত' তাহারও ছিল না। কিন্তু সে ত' তাহাকে এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই!

মা তাহাদের দু'পাশে বসাইয়া খাওয়ান। খাওয়া শেষ হইলে বলেন, 'যাও তোমরা এবার নাচো, গাও, গল্প কর, ফুর্ত্তি কর, আমি সেই কাপুড়ে মিন্সেকে দেখি।'

অমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে, 'হ্যাঁ-মা, বাবাকে তুমি কাপুড়ে'-মিন্সে বল কেন বল ত' ?'

মাও হাসেন। বলেন, 'বলব না? কাপড় কাপড় ক'রেই জনম গেল; ধর্ম্ম নেই, পুণ্যি নেই কাপুড়ে বলব না ত' কি বলব বাছা?'

এমন সময়ে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বেঁটে সান্যাল মশাই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। হাতে তাঁহার সেই মোটা রুপা-বাঁধানো লাঠি, গায়ে সাদা ধপ্‌ধপে লংক্লথের ডবল্-ব্রেষ্ট্ সার্ট, একহাতে একটা কাগজের মোড়কে বাঁধা কয়েকখানা বই।

তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলেন, 'শুনেছি গো সব শুনেছি। আমায় কাপুড়ে বলা হচ্ছিল; না রে?'

অমলা বলে, 'হ্যাঁ বাবা, আমি বারণ করি, মা তবু কিছুতেই শোনে না। 'কাপুড়ে' যেন তোমার ডাক-নাম!'

মা বলেন, 'কাপুড়ে নয়ত' কি! ওই দোকান হ'লো গিয়ে ওদের তিন পুরুষের দোকান। তিন পুরুষ ধরে' কাপড় যা'রা বিক্রী করে তারা কাপুড়ে' নয় ত' কী বাছা?'

সান্যাল মশাই-এর হাতে কাগজের পোঁটলাটা অমলা এতক্ষণ লক্ষ

করে নাই, এইবার সেটা দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, 'বাবা এটা কি?'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'যাও আগে হাত ধুয়ে এসো মা, দেখাচ্ছি, ওটা তোমাদেরই জন্যে এনেছি।'

হাত না ধুইযাই এঁটো হাতে লাফালাফি কবিতেছে দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'বেশ করছে, দিক্ ওই এঁটো হাত তোমার গায়ে লাগিয়ে। তুমিই ত' ওকে খিরিস্তানী করে' তুললে, নইলে বামুনের মেয়ে—এঁটোকাঁটা জ্ঞান থাকে না গা! ছি! ছি!'

শশী ও অমলা দু'জনেই হাত ধুইয়া আসিয়া কাগজে মোড়া পোঁটলাটা খুলিতে বসিল।

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'খাতা, জলছবি, পেন্সিল, দু'জনে সমান-সমান ভাগ করে' নাও। আর ওই যে ছবিও'লা ইংরেজি বই দু'খানা—একখানা তোমার, একখানা শশীর।'

খাতা, পেন্সিল, জলছবি —অমলা ভাগ করিতে বসিল, আর শশী-শেখর বই দেখিতে লাগিল।

দেখিল বই দু'খানির মধ্যে একখানি হোয়াইট্‌এওয়ে লেড্‌ল' কোম্পানীর দোকানের ছবিওয়ালা মূল্য তালিকা আর একখানি কয়েকটি বাড়ী ও পুলের ছবিওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারিংএর বই।

শশীশেখর বলিল, 'এ বই দুটো কেন এনেছেন?'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'সে কি রকম? দু' দু'টাকার এক পয়সা কমে ছাড়লে না বেটা, বল্‌লে, খুব ভাল গল্পের বই বাবু, আপনি নিয়ে যান—ছেলেরা খুশী হবে। তাহ'লে ত' ঠকিয়েছে দেখ্‌ছি।'

অমলা ও বই দু'খানা একবার উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া হাসিতে লাগিল।—'বাবা ভারী ঠকে' আসে বাপু! কাল কি আর সে দোকান-দারটার তুমি দেখা পাবে?'

ঘরের ভিতর হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, 'ঠক্‌বে না? কাপড় কিনতে যারা আসে তাদের পেলে যে তোর বাবা ঠকায়। সেই জন্যেই ত' নিজে ঠকে। বেশ করেছে ঠকিয়েছে ওকে, আচ্ছা হয়েছে!' বলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীব মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, তিনিও হাসিতেছেন।

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'কাল তোর মাকে দিস ও বই দু'খানা, বদ্‌লে নিয়ে আসবে। আমি ত' আর ইংরেজি জানি না যে প'ড়ে নিয়ে আসব, তোর মা জানে, ও কিছুতেই ঠক্‌বে না।'

এই ইংরেজি জানা লইয়া কতদিন কত বচসা তাহাদের হইয়া গেছে।

মা বলিলেন, 'জানিই ত' তোমার চেয়ে জানি। দ্যাখ্ শশী, কই ওয়াটার মানে ওকে জিজ্ঞেস্ কর দেখি, কিছুতেই বলতে পারবে না, আর আমি দ্যাখ্ বলে দিচ্ছি।'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'জানি না? দেখবে বল্‌ব? আন্ ত' বাবা শশী এক গ্লাস ওয়াটার ভারী পিপাসা পেয়েছে।'

শশী ও অমলা দু'জনেই হাসিয়া উঠিল।

শশীশেখর বলিল, 'মা হেরে গেলেন।'

মা বলিলেন, 'আচ্ছা আর একদিন হারিয়ে দেবো দেখিস। ওটা আমারই কাছে শেখা। যাক্; জামা জুতো খুলে তুমি এসো ত' দেখি,

ওগো শুনছো ! এ-সময় আর ওয়াটার খেয়ো না,—খেলে আর ভাত খেতে পারবে না কিন্তু।'

সান্যাল মশাই বলিলেন 'আসি। ওরে বই দুটো তা হলে তুলে রাখ্—কাল দেখব,—বদলে দেয় ত'......'

শশীশেখরের বলিতে কেমন লজ্জা করিতেছিল, তবু সে বলিল, 'বদ্‌লে একটা রামায়ণ......'

কথাটা মা বোধকরি শুনিতে পাইয়াছিলেন, বলিলেন, 'দেখ্‌লে—শশীর কেমন বুদ্ধি দেখ্‌লে ? বা রে শশী, হিন্দুর ছেলে—রামায়ণ মহাভারতই ত' পড়তে হয় বাবা ! আর ওই খিরিস্তানী পোড়ার-মুখী —ওর মুখ দিয়ে বেরোলা না, তুই ইংরেজি পড়ে' প'ড়েই মর ! বাপ্ তোর সায়েবের সঙ্গে বিয়ে দেবে, মেম্-সায়েব হবি।—ওগো শুনছো শশীর জন্যে কাল একটি ভাল রামায়ণ এনে' দিয়ো। রামায়ণখানি তুমি আমায় পড়ে' পড়ে' শুনিয়ো বাবা শশী, কেমন ? আহা, বামুনের ছেলের মুখে রামায়ণ শুনব কাল থেকে, ওই নরুকের সংসার করার পাপ হয়ত' তাতে একটুখানি কমবে বাছা ! ও না আনিয়ে দেয়, কাল তোমাকে রামায়ণ একখানি আমি নিজে আনিয়ে দেবো।'

লাল রঙের পেন্সিলটার ওপর ইলেক্‌ট্রিকের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া শশীশেখর তাহাই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

অমলা তাহাকে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইতে বাধ্য করিয়া, চোখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার কানে-কানে বলিল,

'তবে আর কি, সব দুঃখই ঘুচে গেল তোমার!'

বলিয়া সে তাহাকে সেখান হইতে উঠিয়া আসিবার ইঙ্গিত করিয়া নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা-হারা শশীশেখর মা পাইয়াছে।

কিন্তু মা পাইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। নিজের মা'র কথা এখন সে ভুলিবার চেষ্টা করে, অথচ ভুলিতে পারে না। অমলা তাহার মাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। শশীশেখরও মা বলে।

এবং এই 'মা' কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া শশীশেখরের বুকের

ভিতরটা কেমন যেন করিয়া ওঠে। তাই সে যথাসম্ভব এই ডাককে এড়াইয়া চলিতে চায়।

'মা' বলিয়া ডাকিবামাত্র তাহার নিজের মাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, মা'র সেই শুধু চেহারাটাই নয়, তাহার সেই বুড়ী পিসিমা, গ্রাম-প্রান্তে একটি পুকুরের পাড়ে তিনটি তেঁতুলগাছের পাশে তাহাদের সেই ছোট্ট বাড়ীখানি, মা'র সেই মৃত্যুশয্যা, সেই তুলসীতলা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া মা'র মুখে দেওয়া, মরিবার সময় অন্তিমশয্যায় রুদ্ধবাক্ মাতার সেই অশ্রুসজল তু'টি চক্ষু, গ্রামের দক্ষিণদিকে সেই জোড়া আম-গাছের তলায় মা'র মুখাগ্নিক্রিয়া, নদীতীরবর্ত্তি সেই অন্ধকার শ্মশানের পথ, অন্ধকারে একটি লণ্ঠনেব আলো আর সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে বিকট হরিধ্বনি! ছবির মত একটির পর একটি দৃশ্য শশীশেখরের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে থাকে, আর সজল চক্ষু দু'টি তাহার পাছে কেহ দেখিতে পায় ভাবিয়া লুকাইবার ঠাঁই পায় না।

শশীশেখর সে-বছর ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিয়াছে। পরীক্ষার খবর যতদিন না বাহির হয় ততদিন তাহার পড়িবার কিছু নাই। অমলা পড়ে সেকেণ্ড্ ক্লাসে। শশীশেখর বলে, 'আয় তোর পড়া বলে' দিই।'

স্ফুটযৌবনা শ্যামাঙ্গী তরুণী অমলা হাসিয়া বলে, 'থাক্। ভারি ত', একক্লাস উঁচুতে পড় বলেই মনে করেছ ভারি পণ্ডিত, না? আস্‌ছে-বছর আমিও পরীক্ষা দেবো মশাই। আর যদি একবছর ফেল্ হ'য়ে যাও ত' বাস্…'

শশীশেখব বলে, 'ত্যাখ্ ও-সব খারাপ কথা বলিসনে বলছি অমলা! আমি ফেল্ কবলে তোর সুখ হবে?'

অমলা বলে, 'নিশ্চয়ই হবে। দিব্যি কেমন একসঙ্গে···'

শশীশেখব বলে, 'তা' হলে পড়া আমি ছেড়ে দেবো দেখিস্।'

'ছেড়ে দিয়ে কি করবে?'

কি করিবে তাহা সে নিজেও জানে না। চোখ বুজিয়া ভাবিয়া বলে, 'কি কবব? চাকুরি করব।—না, ব্যবসা করব।'

অমলা হাসিতে হাসিতে বলে, 'তার চেযে ভাল বুদ্ধি বলি শোনো। চাকরিও ক'রে কাজ নাই, ব্যবসাও ক'বে কাজ নেই,—একটি বিয়ে করবে। বিয়ে করে' বৌ নিয়ে—'

শশীশেখর রাগিয়া ওঠে। বলে, 'দুষ্টুমি হচ্ছে? দাঁড়াও মাকে আজই আমি বলে' দিচ্ছি। বাবাকেও বলে' দেবো।'

'কি বলবে?'

'বলব—অমলার বিযে দাও। লেখাপড়া আর হবে না' ·· ·ফন মিছেমিছি···?'

অমলা তাহার মুখেব পানে না তাকাইযা হেঁটমুখে একটা বইএর পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বলে, 'কি জবাব পাবে জানো?'

'কি?'

অমলা এইবার ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। চোখে-মুখে নীরব হাসির চিহ্ন!

শশীশেখর বলিল, 'কি বল্ না?'

অমলা বলিল, 'না বলব না।'

'না বল্‌লি ত' বয়ে' গেল।' বলিয়া শশীশেখর তাহার রামায়ণখানি খুলিয়া পড়িতে বসিল।

দুষ্টুমি করিয়া অমলা বলিল, 'মাথা নীচু কোরো না বল্‌ছি—আমার অন্ধকার হচ্ছে, পড়তে পারছি না।'

শশীশেখর একবার মাথা তুলিয়া দেখিল। একটা টেবিলের দু'পাশে দু'জন দুইটা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া আছে। মাঝখানে আলো। অন্ধকার হইবার কথা নয়। বলিল, 'বা-রে আমি পড়ব না? বেশ করব আমি মাথা নীচু করব।'

বলিয়া সত্যই সে তাহার মাথাটা নীচু করিয়া নীরবে পড়িতে লাগিল।

খুনসুটি করিবার মত আর কোন কথা না পাইয়া ছোট একটুক্‌রা কাগজের উপর অমলা কি যেন লিখিয়া বলিল, 'মা-বাবা কি বল্‌বে বল্‌তে পারলে না ত'?'

শশীশেখর কোনও কথাও বলিল না, মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিল না।

অমলা তাহার মাথার চুল ধরিয়া বলিল, 'এই!'

শশীশেখব তেমনি হেঁটমুখে পড়িতে পড়িতে বলিল, 'বিরক্ত করিস্‌ নে।'

'করব। একশ'বার করব।'

শশীশেখর চুপ করিয়া রহিল।

হাত বাড়াইয়া অমলা তখন তাহার সেই কাগজের টুকরাটি তাহার রামায়ণের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, 'পড়ে' ত্যাখো, কি বলবে—লিখে দিয়েছি।'

শশীশেখর পড়িল। অমলা লিখিয়াছে—'বলবে, তোমার সঙ্গেই অমলার বিয়ে দেবো।'

শশীশেখর তেমনি মাথা নীচু করিয়াই তাহার সেই টানাটানা চোখদুইটি তুলিয়া অমলার দিকে তাকাইয়া কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'যাঃ।'

বলিয়াই সে আবার পড়িতে লাগিল।

অমলা আবার হাত বাড়াইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, 'এই!'

'কি।'

'যাঃ কি-রকম?'

শশীশেখর মুখ তুলিল না। বলিল, 'তা'হলে আমি পালাব এখান থেকে।'

'কোথায় পালাবে?'

'যেখানে খুশী। যেদিকে দু'চোখ যায়।'

অমলা বলিল, 'তা'হলে তুমি পালাও। যাও আজ রাত্রেই যাও।'

'না যাব না।'

'যাবে না কিরকম? যেতে হবে।'

শশীশেখর আর জবাব দিল না। আপনমনেই পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া অমলা তাহার সেই অধ্যয়নরত মুখের পানে নীরবে একাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ একসময় অন্ধকার টেবিলের নীচে অজ্ঞাতে তাহাদের উভয়ের পায়ে পায়ে ঠেকিতেই শশীশেখর বলিয়া উঠিল, 'পায়ে পা দিচ্ছিস অমলা, প্রণাম কর!'

টোবলের উপর মাথা রাখিয়া অমলা ধারে ধীরে বলিল, 'বয়ে গেছে। না করলেই নয়। তুমি কি আমার বর নাকি!'

বলিয়াই সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া টেবিলের উপর তাহার দুই হাতের ভিতর মুখ গুঁজিল।

শশীশেখর বলিল, 'ছি অমলা, ভারি দুষ্টু হয়েছ।'

অমলা বলিল, 'হয়েছিই ত'! দেখবে? এই আলো নিবিয়ে দিলাম। পড়তে তোমায় আমি দেবো না।'

বলিযাই সে হাত বাড়াইয়া ফস্ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল।

ব্যাপারটা শশীশেখবের ভাল লাগিল না। তাড়াতাড়ি উঠিযা দাঁড়াইয়া বলিল, 'নাঃ, তোর সঙ্গে আর পারলাম না দেখছি।'

বলিয়াই সে ঘব হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, অমলা দু'হাত বাড়াইয়া তাহাব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

থর বলিল, 'পথ ছাড়, আমি মাকে বলব গিয়ে'

অমলা বলিল, 'বলবে? কি বলবে শুনি?,

'বলব আমার যা খুশী।'

পশ্চাতে বাবান্দার উপব আকাশেব জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারই আলোকে অমলাব মুখখানি দেখা গেল। একবাব হাসিতে গিয়াও সে হাসিতে পারিল না। মনে হইল যেন মুখের হাসি জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া অমলা তাহার প্রসারিত দুই বাহু দিয়া সজোরে দবজার দুই চৌকাঠ ধরিয়া বলিল, 'যেতে হয়—আমায় জোর করে' ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যাও।'

শশীশেখর আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'পারি না ভেবেছিস্?'

গম্ভীরমুখে অমলা বলিল, 'কিছুতেই না। তোমার চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি।'

'কিন্তু বুদ্ধি ঠিক গরুর মত, গাধার মত।' বলিয়া তাহার হাতের নীচের ফাঁক দিয়া গুঁড়ি বাহিয়া শশীশেখর ফস করিয়া পার হইয়া গেল এবং বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কেমন? হয়েছে ত' এবার!'

অমলাও মৃদু হাসিয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। তাহার পর রাগ করিয়া বলিল, 'আমায় গরু বললে, গাধা বললে। এসো আমি তোমার আগেই মাকে বলে'দিচ্ছি।'

বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বারান্দা পার হইয়া অমলা তাহার আগেই মার কাছে গিয়া ডাকিল, 'মা!'

মা তখন সবেমাত্র সান্যাল-মহাশয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার কথাটা বলিতে যাইতেছিলেন, মেয়েকে দেখিবামাত্র ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'যা বলতে হয় ওই তোর বাপ মিন্সেকে বল্‌গে যা! আমার কথা কি কেউ শোনে?'

সান্যাল-মশাই পলায়ন করিতেছিলেন, অমলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বাবার মুখের পানে তাকাইতেই তিনি হাসিয়া কহিলেন 'শোন্ তোর মা'র কথা শোন্ অমু। তোর মা বলে—তোকে আর পড়তে হবে না। এইবার তোর বিয়ে-থা দিয়ে মেয়ে-জামাই নাতি নাৎনি নিয়ে ওর ঘর করবার সাধ হয়েছে।'

বলিয়াই তিনি একবার তাঁহার ক্রুদ্ধা গৃহিণীর মুখের পানে তাকাইয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিলেন, 'বুড়ী কোথাকার !'

গৃহিনী কহিলেন, 'ত্যাখো বুড়ী বুড়ী কোরো না বল্‌ছি। ভাল হবে না কিন্তু।'

জবাবে সান্যাল-মশাই মুখে কিছু না বলিযা এমন একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলেন যে তাহা দেখিয়া সান্যাল গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বলিলেন, 'মরণ আর কি। তাও যদি না দাঁত-তিনটে বাঁধাতে হ'তো।......তোর হাতে পড়েছি, কর তোব যা-খুশী তাই কর, মেয়েকে [illegible]-এ বি-এ পাশ কবিয়ে রাখো বিবি সাজিয়ে, তারপর যাবে কোন্‌দিন রে[illegible] নি[illegible] [illegible]ম'রে, তখন সাধ-আহ্লাদ সব বেরিয়ে যাবে দেখো। জানি— অ[illegible] অপ[illegible] [illegible]মার বহুৎ কষ্ট আছে তা, জানি ! দিবারাত্তির লোকের গলা [illegible]পড়া [illegible]কিয়ে পয়সা নিলে কি তার সুখ হয় কথনও ? ছি ! ছি !,
[illegible] ততদি[illegible] বলিতে চোখদুইটা তাঁহার জলে ভরিয়া আসিল। চশমাটা অ[illegible] চোখের জল মুছিবার জন্য তিনি ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

[illegible] গৃহিণীর কান্না দেখিয়া সান্যাল-মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাগিয়া রুখিয়া তিনি এম্‌নি ভাবে তাঁহার পিছু-পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিলেন যে, মনে হইল হয়ত-বা তিনি তাঁহাকে মারিয়াই বসিবেন ; কিন্তু দেখা গেল, গৃহিণীর কাছে গিয়া নিতান্ত নরম সুরে তাঁহাকে তিনি বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—'বলছি হাজার বার তবু বুঝবে না ? কান্নাকাটি ঝগড়া-ঝাঁটি ছাড়া আর কথা নেই ? ন'বছর বয়সে নোলক্‌ পরে' ত' নিজের বিয়ে হয়েছিল, তার ফল কি হ'লো শুনি ? খালি ঝগড়া, ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করে' কান্না আর কান্না ! কারও মনে ত' একবিন্দু

সুখ নেই। তাই বলি—নিজের দেখে বোঝা উচিত। আর দ্যাখো ত' সায়েবদের! দিব্যি কেমন লেখাপড়া শিখে বড় হ'য়ে বিয়ে করে হাতে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে রাস্তায় যখন বেরোয়—দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এত দেখে শুনেও ত' চোখ ফোটে না!'

সান্যাল-গৃহিণী বলিলেন, 'চোখ ফুটে আমার আর কাজ নেই বাপু, তুমি যাও এখান থেকে। মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে, লজ্জা-শরম কি কিছুই নেই? বেহায়া মিন্সে! হিঁদুর ঘর, বামুনের ঘর,—যা রয়-সয় তাই করতে হয়। বুঝিয়ে কি করব তোমাকে, তুমি যাও, তুমি বুঝবে না।'

বলিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তিনি ভাল করিয়াই কাঁদিতে বসিলেন।

'তবে কাঁদো তুমি মর এইখানে।' বলিয়া সান্যাল-মশাই ... বললে। ঢুকিয়াছিলেন তেমনি আবার দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া বারান্দা অতিক্রম হইয়া চলিয়া গেলেন।

বারান্দার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অমলা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া—তাহার বাবা চলিয়া গেলে সে তাহার মার কাছে গিয়া ডাকিল, 'মা! কি হ'লো মা? কিছু বুঝতে পারছিনে।'

মা বলিলেন, 'বুঝে কাজ নেই মা। থাকো তোমরা বাপবেটিতে। আমি মরি। কিন্তু এই আমি ব'লে গেলাম বাছা, চোদ্দ পুরুষ তোমাদের নরকস্থ না যদি হয় ত'—'

অমলা যেন কিছুই জানে না! বলিল, 'আমায় বলতে দোষ কি মা? বলই না—কি হয়েছে?'

চশমাটা মা আবার চোখে পরিয়া বলিলেন, 'হয়নি কিছু অমলা,

কিন্তু মিন্সের কাজ গ্যাখ্ দেখি ! আজ বিষ্যুৎবার, রাত্তির কাল, আমায় রাগিয়ে দিয়ে কি কথাটাই না বলালে বল্ দেখি ? সময় নেই, অসময় নেই, মরার কথা বললাম,—ছি ছি আমার মুখে আগুন ! না মা, আর তোমাদের সঙ্গে কথা যদি আমি বলি ত' এই নাকখৎ দিচ্ছি ।'

বলিয়াই চশমা তুলিয়া আবার তিনি একবার চোখদুইটা তাঁহার [illegible]ছিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, 'অপরাধের মধ্যে এই বলা আমার অপরাধ হয়েছে যে মেয়ের একটি ভাল পাত্তর খুঁজতে লোকে আজকাল ন্যক্কালের একশেষ হয়ে যায়। তা তোমার কপাল ভালো, ভগবান হুট্ করে [illegible] থেকে জুটিয়ে যখন দিলেন তখন ছেড়ো না।—এই হ'লো অদৃষ্টে [illegible] মা, এইতেই এত ! উনি বলেন, থামো, আরও বড় হোক্, কেটে [illegible] শিখুক, ছেলে আগে দুটো তিন্টে পাশ করুক্—তারপর······ [illegible] বাঁচ্‌বঁ কি ? কই, তুই বল্ না মা !'

খু[illegible] দাড়াইয়াই ছিল। জানালার পথে একবার ভাল করিয়া [illegible]ইয়া কি যেন দেখিল। তাহার পর বেশ জোরে জোরেই বলিল, ছেলে কে মা ? তোমাব কথা কিচ্ছু আমি বুঝতে পারছি নে।'

মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, 'তুইও বাছা আর ন্যাকামি [illegible]বিসনে, ভালো লাগে না। ছেলে—আমাদের শশী—শশীশেখর ! আহ্ [illegible]ক ছেলে বল্ ত' ! মা-হতভাগী অমন ছেলে রেখে ম'লো কি করে' কে জানে!'

জানালার দিকে অমলা তখনও তাকাইয়াছিল। মনে হইল, যেন একটা দীর্ঘাকৃতি ছায়া সেখান হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে।

মুখে কিছু না বলিয়া ঠোঁটের ফাঁকে গোপনে একটুখানি হাসিয়া অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৮

স্বামীকে বুঝাইবার জন্য মা সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। সান্যাল-মহাশয় যে কিছু বুঝেন না, তাহা নয়; তিনি ধরিয়া বসিয়াছিলেন যে, মেয়েটা যখন এতদূর পড়িয়াছে তখন সামান্য এক-আধ বছরের জন্য পড়াটা তাহার নষ্ট করিয়া লাভ কি। ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিতে তাহার আর বেশি দেরী নাই, সুতরাং পাশ করিবার পরেই তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত।

শশীশেখরও তখন আই-এ পড়িবে।

অত দেরি করা—মায়ের যদিও ইচ্ছা নয়, তবু কি করিবার করে। তাহাতেই তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল। বলিলেন, 'কেন এত ক'রে বলছি বুঝতে পেরেছ? মেয়ে ত' সবে ওই একটি, পরের বাড়ী ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে করে না। কোথায় কোন তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, তার চেয়ে এ বরং শশীর সঙ্গে দিয়ে দাও, দু'জনে আমার চোখের সুমুখে থাকবে। মরবার দিনে দু'জনকে একই সঙ্গে দেখতে পাব।'

সান্যাল-মহাশয় বলিলেন, 'বেশ তাই হবে।'

মা বলিলেন, 'হবে নয়, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর।'

সান্যাল-মহাশয় তাহাই করিলেন।

পরদিন শশীকে কাছে ডাকিয়া তাহার জাতিগোত্র কুলশীলের পরি

লইতে গিয়া হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পৈতে হয়েছে?'

শশী নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

সান্যাল-মহাশয় বলিলেন, 'তাই ত' বলি, বামুনের ছেলে কিন্তু গলায় পৈতে কোনোদিন দেখিনি। ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে ত!'

বলিয়াই কথাটা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জানাইবার জন্য সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন এবং দু'জনের পরামর্শমত ইহাই স্থির হইল যে, এইমাসেই ভাল একটি দিন দেখিয়া শশীশেখরকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইতে হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই।

পুরোহিত ডাকিয়া যজ্ঞোপবীতের দিনস্থির হইয়া গেল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শশীশেখরের মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিকবস্ত্রে ভিক্ষান্নজীবী দণ্ডী ব্রহ্মচারী সাজাইয়া অগ্নি-দেবতার সম্মুখে তাহাকে ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত করা হইল। শশীশেখর নবজন্ম পরিগ্রহ করিল।

পাড়া-পড়শী মেয়েরা আসিয়া আনন্দ করিতেছে, অমলার সহপাঠী বান্ধবীরা আসিয়াছে। চারিদিকে কোলাহল হট্টগোলের মাঝখানে সান্যাল-মশাইকে এক একবার দেখা যাইতেছে মাত্র। বেঁটেখাটো সদানন্দময় মানুষটি, একটা থলির মধ্যে টাকাপয়সা আনি-দু'আনি ভর্ত্তি করিয়া সেটা তিনি তাঁহার কোমরে ঝুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, চলিবার সময়ে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া শব্দ উঠিতেছে। আজ তিনি যেন একেবারে কল্পতরু হইয়া উঠিয়াছেন। যে যখন যাহা চাহিতেছে তাহাই পাইতেছে। নিতান্ত অসহায় নিরাশ্রয় একটি বালকের তিনি

আশ্রয় দিয়া আজ এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছেন, সন্তানের অভাব তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। মনে-মনে আনন্দের আর সীমা নাই।

সান্যাল-গৃহিণী কিন্তু সে সব কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছেন। পাড়া-পড়শী মেয়েদের যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই তিনি সাদরে আহ্বান করিয়া সহাস্যে কহিতেছেন, 'এসেছ মা? এসো, এসো তোমরা না এলে আমার চলে? আমার অত কষ্টের ছেলে···মাথা মুড়িয়ে গিরি-বস্ত্র পরেছে, তাও কেমন মানিয়েছে ভ্যাখো!'

বলিয়া তিনি নিজেই একবার সস্নেহ মুগ্ধদৃষ্টিতে শশীশেখরের মুখের পানে তাকাইয়া লইতেছেন।

দোতলার বারান্দার রেলিংএর উপর ভর দিয়া অমলা তাহার আরও দুইজন সঙ্গিনীকে দুই পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। মা তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, 'হাসচিস্ কেন লা?'

অমলা বলিল, 'হাসছি তোমার ছেলেকে দেখে। আহা, কেমন মানিয়েছে বলত! মাথাটা ন্যাড়া ক'রে দেওয়া হয়েছে, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি, হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি, পায়ে কাঠের খড়ম্! ওই খড়ম্ পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে পা হড়্‌কে প'ড়ে না যায় ত' আমি কী। দেখো তুমি, বেহ্মচারীর ন্যাড়া মাথা এই এতখানি ফুলে উঠবে। তার চেয়ে এক্ষুনি তুমি বারণ ক'রে দাওগে মা, খড়ম প'রে ও যেন না হাঁটে।'

মা কিন্তু তাহার কথায় কান দিলেন না।

এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া কাছেই এক প্রতিবেশিনী মহিলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ভ্যাখোতো মা, কি 'করি বলত' এ মেয়েকে

নিযে? ও অমন ছিল না মা, ওর ওই বাপ-মিন্সে ওকে অমনি ক'রে দিলে।'

বলি.ত বলিতে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারী তখন উপবীত ধারণ করিযাছে। পুরোহিত বলিলেন, 'এবার ভিক্ষা দিতে হবে।'

প্রতিবেশিনীরা আমন্ত্রিত হইযা ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিযা কেহ-বা পুণ্যসঞ্চযের উদ্দেশ্যে, কেহ-বা বিদাযী বস্ত্রের লোভে সকলেই কিছু-না-কিছু সঙ্গে আনিযাছিলেন। কেহ-বা রেকাবিতে ক'রিযা কিছু আতপ তণ্ডুল, কেহ-বা আধুলি, কেহ-বা টাকা লইযা আসিযা দাঁড়াইলেন। সান্যাল-গৃহিণীকেই সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা দিতে হইবে। একটি রূপার রেকাবিতে করিযা আতপ চাউলের সঙ্গে চারটি স্বর্ণমুদ্রা লইযা দাঁড়াইযা দাঁড়াইযা তিনি সেই সৌম্য-সুন্দর, উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-বালকের মুখের পানে তাকাইযা থর্ থর্ করিযা কাঁপিতে লাগিলেন।

পুরোহিতের আদেশমত শশীশেখর তাহার গৈরিক-রঙ্গিন ভিক্ষার ঝুলি সেইদিকে আগাইযা দিযা বলিল 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি। ভবতি ভিক্ষাং দেহি।'

ভিক্ষা দিতে গিযা মাতার চক্ষু সজল হইযা আসিল। বহুদিন পূর্ব্বে একদা এক নিদাঘতপ্ত অপরাহ্নবেলায এম্‌নি করিযাই নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার স্বামীর পশ্চাতে এই ব্রাহ্মণবালক তাঁহার কাছে এমনি একটি ভিক্ষার নীরব নিবেদন লইযাই উপস্থিত হইযাছিল।

সেদিন তাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যানও করিতে পারেন নাই, রৌপ্য-পাত্রে স্বর্ণমুদ্রা দান করিবার জন্যও অগ্রসর হইযা আসেন নাই, কিন্তু

দিনে দিনে একটু একটু করিয়া পুত্রহীনা জননীর বঞ্চিত ব্যাকুল বক্ষ হইতে কি সুধা নিঙড়াইয়া যে তাহাকে দান করিয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

ব্রহ্মচারীকে একবার গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পা বাড়াইতে হয়, মাতাই তাহাকে তাঁহার দুই সস্নেহ ব্যাকুল ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া গৃহাশ্রমে ফিরাইয়া আনেন।

পুরোহিতের নির্দ্দেশমত শশীশেখর পা বাড়াইল। প্রবাদ আছে যে, আড়াই পা'র বেশী কেহই আর কেহ যদি ভুলিয়াও তিন পা বাড়াইয়া বসে ত' সংসারে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন না একদিন তাহাকে যে কোন প্রকারে ঘর-সংসার আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিতেই হয়।

শশীশেখরকে ফিরাইবার জন্য পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সান্যাল-গৃহিণী তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মণ্ডপের নীচে নিমন্ত্রিত সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মচারীর এই পা-বাড়ানোর জনপ্রবাদ লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল। দাঁড়াইয়া তিনি তাহা শুনিয়াছেন। এবং শুনিবার পর হইতে নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া তিনি শুধু এই কথাই ভাবিতেছিলেন যে, গৃহহীন মাতৃহীন আত্মীয়স্বজনহীন উদাসীন এই ব্রাহ্মণ, বালক শশীশেখরের জীবনের সঙ্গে ব্যাপারটা চমৎকার মিলিয়া গেছে। সেও ত' অমনি ভিক্ষাপাত্র সম্বল করিয়া এতদিন কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইত কে জানে, তিনিই তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং শুধু ফিরাইয়া আনাই নয়, আজ এই পুরোহিত ব্রাহ্মণ অগ্নিদেবতার সম্মুখে ব্রহ্মচারী শশীশেখরকে আনিয়া গৃহী করিবার

সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন। সে সঙ্কল্প ত' তাঁহার আছেই।. এমন-কি তাঁহার একমাত্র কন্যা অমলাকে এই শশীশেখরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে পুরাদস্তুর গৃহী করিবার জন্যই ত' আজ তাহার এই যজ্ঞোপবীতের আয়োজন? এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া পুত্রকন্যাপরিবৃত কন্যা-জামাতার পরমানন্দময় সহজ সচ্ছল একটি সুখ-নীড়ের পরিকল্পনায় তিনি এমনি তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শশীশেখরের পা বাড়ানো যে কখন্ শেষ হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'এই রে! তিন পা বাড়িয়েছে।'

পুরোহিত হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া নিজের হাত দিয়াই শশীশেখরের একটা পা একটুখানি পিছনে সরাইয়া দিয়া বলিলেন 'তা হোক্; ও কিছু না, ও কিছু না।'

মা'র বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার দুই ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া শশীশেখরকে জড়াইয়া ধরিলেন।

তাহার পর ব্রহ্মচারীর গৃহপ্রবেশ।

তিন দিন তিন রাত্রি তাহাকে এমন একটি গৃহের মধ্যে অবস্থান করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে—যে-গৃহে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। মুখ দিয়া একটি বাক্য উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। মৌনী নির্ব্বাক্ ব্রহ্মচারী! একবস্ত্রে ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে, ভিক্ষালব্ধ আতপ-তণ্ডুলের হবিষ্যান্ন একবেলা আহার, প্রতি রাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে আবার গৃহপ্রবেশ। একমাত্র পরিচর্য্যাকারিণী ছাড়া আর-কাহারও মুখদর্শন

নিষেধ। নিতান্ত নিভৃত অন্তঃপুরে নীরবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তপঃ-সাধনায় ব্রাহ্মণ্য অর্জ্জন করিতে হইবে। এই নবজন্ম-পরিগ্রহ শশীশেখরের মন্দ লাগিল না।

মা বলিলেন, 'অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না বাবা, ও কেউ করে না।'

সান্যাল-মহাশয় একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঃ, আমি ত' ও-সব কিছু করিনি। গায়ত্রী-মন্ত্রই মুখস্থ করেছিলাম তিন মাসে।,

মা বলিলেন, 'তোমার কথা ছেড়ে দাও। কাপড়ের ব্যবসা কর. তুমি ত' বেনে গো! তুমি আবার বামুন নাকি?'

শশীশেখর কিন্তু সে-সব কথায় কান দেয় না। পুরোহিত একটি কাগজের পৃষ্ঠায় তাহাকে গায়ত্রী-জপের মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছেন। সেই কাগজের টুকরাটি সম্মুখে রাখিয়া ক্ষীণ দীপালোকিত কক্ষের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে নীরবে সে শুধু ঋজু হইয়া বসিয়া বসিয়া মনে-মনে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করে। এবং উহার মজাই এই যে, যত সে উচ্চারণ করিতে থাকে ততই তাহাতে তন্ময় হইয়া যায়। ভাবে বুঝি সে এমনি করিয়া ধীরে-ধীরে তপঃশুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল এবং শুচিশুভ্র নিষ্কলঙ্ক হইয়া আর-একটি নবজীবন লাভ করিবে। তাহা হইলে মা তাহার যেখানেই থাকুক, খুশী নিশ্চয়ই হইবেন, চাই-কি এবার হয়ত' তিনি তাঁহাকে দেখা দিতেও পারেন।

একাকী নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে বসিয়া তাহার মা'র কথা, তাহার বিগত জীবনের কথা ভাবিতে শশীশেখরের বেশ ভালই লাগে; ভাবিয়াছিল. এমন নিবিড়ভাবে মা'কে তাহার ডাকিবার সুযোগ কোনোদিন সে পায়

নাই, শুধু বার তাহার মা'র কথা ভাবিয়াই তিনটি দিন সে কাটাইয়া দিবে। তবু কি জানি কেন, এই ব্রহ্মচর্য্যের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা ভাবিয়া প্রথমে মনে তাহার একটুখানি আশঙ্কাই জাগিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে মা'র কথা তখনও ভাবে নাই, সারাদিন ধরিয়া একাগ্রচিত্তে স্থির ধীর মৌন গম্ভীরভাবে শুধু গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়াছে, তাহাতেই কেমন যেন তাহার নিতান্ত অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটি পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ সে অনুভব করিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রারম্ভেই পুরোহিত আসিয়া গঙ্গাজল ও কোশাকুশি লইয়া তাহাকে সন্ধ্যা-বন্দনা শিখাইয়া গেলেন। তাহার পরেই মা আসিলেন একবাটি গরম দুধ ও কিছু ফল লইয়া।

আহারাদি শেষ করিয়া গৃহকোণের প্রদীপশিখাটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া শশীশেখর বসিয়া আছে, এমন সময়ে হাস্যকলোচ্ছ্বাসে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া অমলা ও তাহার দুইজন নবাগতা সখী সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

হাসিতে হাসিতে অমলা বলিল, 'কই গো বেহ্মচারী, কোথায় তুমি ?' বলিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাহারই সমবয়সী, আর একজন অমলার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে।

শশীশেখরকে দেখাইবার জন্যই অমলা তাহাদের সঙ্গে আনিয়াছিল ' ভাবিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে একবার পরিচয় করাইয়া দিয়াই সে চলিয়া আসিবে। কিন্তু পরিচয়ের পূর্ব্বেই বড় মেয়েটি নিজেই নিজের পরিচয় করিয়া লইল। শশীশেখরের একেবারে গা ঘেঁসিয়া বসিয়া নিজের

হাতখানি তাহার মুণ্ডিত মস্তকের উপর রাখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কি ভাই, কথা কোচ্ছো না যে! মাথা ন্যাড়া ক'রে দিয়েছে ব'লে?' না পরিচয় নেই ব'লে? পরিচয় আবার কি? তুমি অমলার বর, আমরা অমলার বন্ধু।'

অমলা তাহার পিঠে এক চড় মারিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'যাঃ!'

আর একটি মেয়ে তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া হাসিয়া একেবারে ঢলিয়া পড়িতেছে।

বাসর-ঘরে জামাইকে লইয়া শ্যালিকারা যেমন হাস্য পরিহাস করে, শশীশেখরকে লইয়া ইহারাও ঠিক তেমনি করিতে লাগিল।

শশীশেখর যত বেশী গম্ভীর হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করে, বড় মেয়েটির তরফ হইতে হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে ইঙ্গিতে ততই তাহাকে ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে।

ছোট মেয়েটির হাসি আর কিছুতেই বন্ধ হয় না! আর অমলা একেবারে চুপ! এমন যে তাহারা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। "চল্ একটু মজা করি' বলিয়া অমলাকে তাহারা টানিয়া আনিয়াছে। এমন করিবে জানিলে, আসিত না কিছুতেই।

বড় মেয়েটা যদি-বা পথে ছিল, ছোটটা একেবারে ডাকাতের একশেষ। হাসিতে হাসিতে হঠাৎ এক সময়ে সে তাহার গাত্রবস্ত্রাঞ্চল শিথিল করিয়া দিয়া অন্ধকারে যেন হোঁচট্ খাইয়াই শশীশেখরের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল। এবং পড়িবামাত্র খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, 'অমলা, তুই ভারি বজ্জাত ত'। এমনি ক'রে ঠেলে দিতে হয়?'

শশাংশেখর বিরক্তিভরে দুইহাত দিয়া তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখা গেল, কৌতুক-পরায়ণা সুচতুরা যুবতী তখন তাহার শুভ্র সুকোমল দুটি মৃণাল বাহু দিয়া এমনি জোরে তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে যে, সহজে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

মেয়েটা বলিল, 'কথা কও, নইলে—'

বলিয়াই সে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন একটা কথা বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া খুব জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল।

শশাংশেখরের মনে হইল, কে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া তাহাকে চাবুক মারিল এবং সে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটাকে যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া তাহার অঙ্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া রাগে একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

অমলা দাঁড়াইয়াই ছিল। কথাগুলা যেন তাহার বুকে শেলের মত গিয়া বাজিল এবং মনে হইল যেন সে শুধু তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে দরজার কাছে গিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।

পড়িয়া গিয়া ছোট মেয়েটার বোধ করি আঘাত লাগিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, 'বটে! দরজাটা বন্ধ ক'রে দে ত' অমলা, আমি দেখি একবার বেহ্মদত্যিকে!'

দরজা ত' অমলা বন্ধ করিলই না, বরং বিষণ্নমুখে ক্ষুব্ধকণ্ঠে আদেশ করিল, 'প্রীতি, চলে' আয়! শাস্তি, তুইও আয়।'

এবং আর কিছু না বলিয়া সকলের আগেই সে ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। শশীশেখরের মুখের পানে একবার ফিরিয়া তাকাইবার সাহসও তাহার হইল না।

শান্তি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চটুল-চক্ষে শশীশেখরের দিকে একবার চাহিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে তাহার সেই যুক্ত হস্ত কপালে ঠেকাইয়া একটি প্রণাম করিল। বলিল, 'দণ্ডবৎ দেবতা!'

বলিয়াই সে তাহার স্মিতহাস্যে একটি রমণীয় লাবণ্য বিস্তার করিয়া তাহার স্খলিত অঞ্চলাগ্রভাগ বুকের উপর দিয়া কাঁধের উপর জড়াইতে জড়াইতে নিঃশব্দ-চরণে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে ফেলিয়া দেওয়ার প্রতিশোধ না লইয়া প্রীতির যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু তাহাকে যাইতে হইল। কোমরে জড়ানো কাপড়টা সে তাহার কাঁধে ফেলিয়া দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ওগো, ও জামাই, তাকাও এইদিকে! অমন আমি অনেক দেখেছি।'

বলিয়া সে তাহার বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বড় নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে লাগিল। ওদিক হইতে শান্তি তাহার হাত ধরিয়া না টানিয়া আনিলে সে যাইত কিনা সন্দেহ।

রাত্রে মা ডাকিলেন, 'অমলা আয় খাবি আয়। তোর সে বন্ধু দু'টি চলে' গেছে?'

নিতান্ত শুষ্কমুখে অমলা বলিল, 'হ্যাঁ মা, চলে' গেছে। কিন্তু আজ

আর আমি খাব না মা, দিনে বড় অবেলায় খেয়েছি, খেলে অসুখ করবে।'

মা বলিলেন, 'যাক, তবে কাজ নেই খেয়ে। তোর সে বাপ-মিন্সে গেল কোথায় লা, জানিস?'

অমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়াই সে তাহার মা'র কাছে আগাইয়া আসিয়া দিব্য শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ মা, ওকে আর কতদিন থাকতে হবে ওই অন্ধকার ঘরে?'

মা বলিলেন, 'তিন দিন।'

'আচ্ছা হ্যাঁ মা, ব্রহ্মচারীকে কথা কইতে নেই?'

'না বাছা, ভারি মুস্কিল। তবে ও সবাই সব পারে না, এই যা।' ব্যাকুলকণ্ঠে অমলা আবার প্রশ্ন করিল।

'না পারলে দোষ হয়?'

মা বলিলেন, 'তা হয় বই-কি বাছা। দোষ হবে না? বেহ্মচারী যে? ওকে এখন আমরাও দুবেলা পেন্নাম করব। বারান্দায় আলো ছিল না বলিয়া দেখা গেল না, নহিলে দেখা যাইত—অমলার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুর ধারা বহিয়াছে এবং সেই নিরালোক নিস্তব্ধ গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ ক্রন্দনে তাহার বুকের ভিতরটা তখন বারে বারে গুমরিয়া মোচড় খাইয়া উঠিতেছে।

৯

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীকে উঠাইয়া স্নানআহ্নিক করাইতে হইবে, তাহা ছাড়া রাত্রে তাহার কিছু প্রয়োজনও হইতে পারে, একলা ঘরে অমন করিয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখা উচিত নয় ভাবিয়া মা সেদিন রাত্রে তাহার দরজার সুমুখে শুইয়া রহিলেন। বলিলেন, 'দরকার যদি কিছু হয় ত' বাবা আমায় যেন জাগিয়ে দিয়ো। আমি এই দোরের কাছটিতে শুয়ে রইলাম।'

কিছুক্ষণ পরে অমলা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল 'আমিও তোমার কাছে শোবো মা।'

বিছানার একটা দিক্ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া মা বলিলেন, 'শো'।

কিন্তু গভীর রাত্রে সর্ব্বাঙ্গে তাহার কেমন যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতি লাভ করিয়া সহসা শশীশেখরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন তাহাকে প্রাণপণে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই পাশে শুইয়া আছে এবং সে নিজেও কখন নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

শশীশেখর হাত দিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, এক উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতী। কে সে? অমলা, না তাহার সে সখীদের মধ্যে একজন? সত্য, না সে স্বপ্ন দেখিতেছে? তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে একটুখানি দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কে? অমলা?'

বুকের কাছে মুখ রাখিয়া অমলা কাঁদিতে লাগিল। বলিল, 'বল তুমি আমায় ক্ষমা কবলে !'

হ্যাঁ, অমলাই বটে !

'কিসের ক্ষমা ?' বলিয়া শশীশেখর উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল, অমলা কিছুতেই তাহাকে উঠিতে দিল না। দুই হাত দিয়া গলাটা তাহার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'শোনো, নইলে আমি এক্ষুণি মরে' যাবো।

'মব।' বলিয়া শশীশেখর আবাব উঠিবার চেষ্টা কবিল। কিন্তু নারী নাকি ইচ্ছা ক'বিলে সবই কবিতে পাবে। অমলাব কাছে শশীশেখবকে পরাজয় স্বীকাব করিতে হইল। জোব করিযা অমলাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওযা ত' দূরেব কথা, কিয়ৎক্ষণ পবে দেখা গেল, উভয়েই উভয়েব আলিঙ্গনবদ্ধ হইযা চুপ কবিয়া পড়িয়া আছে। শশীশেখব মুখে তাহার একটি কথাও বলিতেছে না। কাঁদিতে কাঁদিতে অমলাও কখন চুপ কবিযাছে।

শশীশেখব তাহাকে ক্ষমা করিযাছে ভাবিয়া অমলা নিশ্চিন্তমনে আবার কখন সেখান হইতে উঠিয়া তাহাব মা'ব কাছে আসিয়া শুইযাছিল কে জানে। বড় ঘড়িতে ঢং ঢং কবিয়া পাঁচটা বাজিতেই মা'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রহ্মচাচীকে জাগাইবাব জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিযা বসিলেন।

উঠিতে তাহাব দেবি হইয়া গিযাছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ঘবে ঢুকিয়া আলো জ্বালিলেন। দেখিলেন, শশীশেখর তাহাব শয্যায় নাই। বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, 'শশী।'

কাহারও কোনও সাড়াশব্দ মিলিল না

উঠানের আলোটা জ্বালিয়া মা একবার কলতলায় গেলেন, একবার নীচে নামিলেন, উপরের এবং নীচের প্রত্যেকটি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও শশীর সন্ধান যখন আর কোথাও পাইলেন না, তখন একেবারে অধৈর্য্য হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বাড়ীর প্রত্যেককে জাগাইয়া তুলিয়া 'শশী' 'শশী' করিয়া চীৎকাব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কোথায় শশী!

বাড়ীর চাকরটা আসিয়া খবর দিল, সদর দবজা খোলা।

সান্যাল মহাশয় ব্রহ্মচারীর ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলেন,—ভিক্ষার ঝুলিতে মাত্র আতপ চাউল, সন্দেশ ও পৈতাগুলি পড়িয়া আছে, গিনি ও টাকা যাহা-কিছু দেওয়া হইয়াছিল, সে-সব কিছুই নাই। গৈরিক বস্ত্র, উত্তরীয়, দণ্ডী, খড়ম্,—সবই সে ফেলিয়া গেছে।

মা বলিলেন, 'জানি। যখনই ও আড়াই পায়ের জায়গায় তিন পা বাড়িয়েছে, তখনই আমার বুক দুর্ দুর্ করে' উটেছে, তখনই জানি ও থাকবে না!'

সান্যাল মহাশয গৃহিণীকে বোধ করি সান্ত্বনা দিবায় জন্যই বলিলেন, 'তাছাড়া পরের ছেলে···ও একদিন যেতোই। দু'দিন পরে যেতো, না হয় দু'দিন আগে গেল।'

দাঁত কিসকিস্ করিয়া করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'থামো, তুমি থামো! তুমি যদি অমন না হবে ত' এমন হবে কেন?'

একে বেচারা কয়েকদিন পরিশ্রমের পর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আজ একটুখানি বিশ্রাম করিতেছিল; পরিপূর্ণ বিশ্রামের পূর্ব্বেই ত' এই ব্যাঘাত; তাহার উপর স্ত্রীর ".জে কথা বলিতে গিয়া অপ্রস্তুতের একশেষ

হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইযা ভাবতে লাগিল, সে কেমন এবং এমন কি দোষ সে করিয়াছে যাহার জন্য ছেলেটা পলাইয়া যাওয়ার সমস্ত অপরাধ তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়িতে পারে!

মা বলিলেন, 'হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়? তাই যাও একবার—কষ্ট করে' রাস্তায় বেরিয়ে গ্যাখো সে কোথায় গেল! আমার যাবার হ'লে যে এতক্ষণ আমিই যেতাম।'

সান্যাল মহাশয় এতক্ষণে তাঁহাব রাগেব কাবণ খানিকটা বুঝিলেন। চাকবটাকে সঙ্গে লইয়া মুখে আর কোনও কথা না বলিয়া খালি গায়ে খালি পায়েই শশীশেখরের সন্ধানে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অমলার ঘুম অনেকক্ষণ ভাঙ্গিয়াছিল। কথাটা শুনিয়াও সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পরে যখন আর তাহার অবিশ্বাসেব কিছুই বহিল ন', তখন সে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়া একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ ব্রহ্মচারীর শূন্যগৃহের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সেইখানেই উপুড় হইযা বালিসে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অন্ধকারে কাঁদিতে সুরু করিল।

শশীশেখব আবার নিরুদ্দেশ!

সান্যাল-মহাশয় চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পুলিশে খবর দেওয়া, কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপানো হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তান নিরুদ্দেশ হইলে মানুষের যাহা যাহা করা উচিত তিনি সবই করিয়াছেন। কিন্তু সেই মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবস্ত্র-পরিহিত গৌবাঙ্গ সুন্দর নিরুদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণসন্তানের সংবাদ কেহই আর তাঁহাকে দিতে পারে নাই।

ডিটেক্‌টিভ্ নিযুক্ত করিতে গিয়া শুনিলেন, ছেলের ছবি ছাড়া তাঁহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এখানেও সেই

একই ভুল করা হইয়াছে। শশীশেখরের ছবি একখানিও নাই। তবু তিনি মৌখিক বিবরণ দিয়া ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিলেন। এবং তাহার ফল হইল এই যে, কিছুদিন ধরিয়া কয়েকজন লোক বেশ উপার্জ্জন করিয়া লইল।

শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না।

বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত অযাচিতভাবে যে আশ্রয় সে লাভ করিয়াছিল, সেই স্নেহ-নীড় পবিত্যাগ করিয়া স্নেহের কাঙাল সে দুরন্ত পাখী যে আবার কোথায় কি আশায় উড়িয়া গেল কে জানে।

কোথায় কি ভাবে যে তাহাব জীবন কাটিয়াছে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে মাঝে-মাঝে যখন যেটুকু পারিয়াছি, সেইটুকুই বলিব।

অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কলিকাতায় কলেজেব ছাত্রদের হোষ্টেলে হোষ্টেলে শশীশেখর চা ও চুরুট বিক্রি করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে তাহাকে চট্ করিয়া চিনিবার উপায় নাই। গোঁফ দাড়ি কামানো অতি সুন্দর চেহারা; সাজ-পোষাক দেখিলে মনে হয়, রোজগার সে মন্দ করে না। যেমন কথা বলিবার ভঙ্গী, তেম্‌নি মিথ্যা বলিবার কৌশল! জিনিস লইয়া একবার সে যাহার কাছে যায়, তাহার আর 'না' বলিবার ক্ষমতা থাকে না।

কিছুদিন এই ব্যবসা চালাইবার পর আবার কোথায় যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল কে জানে। অনেকের কাছে অগ্রিম টাকা লইয়া, অনেককে অনেক জিনিস আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই যে সে উধাও হইয়া গেল,—তাহার আর কোনও ঠিকানা মিলিল না।

বছর দুই তিন পরে, একবার এক পশ্চিমের শহরে কোটপ্যাণ্ট্
পরিয়া হাতে রূপায়-বাঁধানো ছড়ি লইয়া চোখে কালো ফিতায়-বাঁধা
পাঁশ্‌নে চশমা দিয়া, কিছুদিনের জন্য শশীশেখরকে কোন্ এক বীমা-
কোম্পানীর দালালী করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর একদিন
দেখা গেল, কিসের যেন একটা এজেন্সী লইয়া শশীশেখর জাহাজে চড়িয়া
রেঙ্গুন চলিয়াছে।

এমনি করিয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিমলা, করাচি, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি
বড় বড় শহরে হঠাৎ শশীশেখরকে দু-চারদিনের জন্য মাঝে-মাঝে দেখা
যায়। আবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া যে অদৃশ্য হয়—কেহই
বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা সাহেব সাজিয়া থাকে, অনর্গল চমৎকার
ইংরেজিতে কথা বলে, মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ট্রেণে যাইতে হইলে
সাধারণতঃ সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেনে, বড় বড় হোটেলে গিয়া ওঠে,
রীতিমত চেক্ দিয়া টাকা দেয়।

মাতাপিতৃহীন নিরাশ্রয় সচ্চরিত্র সে শশীশেখর আর নাই।

এখন আর সে তাহার সেই দুঃখিনী জননীর কথা, মামামামীর কথা,
সান্যাল-মহাশয়, অমলা ও অমলার মা'র কথা ভুলিয়াও কোনোদিন
ভাবে কিনা কে জানে।

ভাবিবার অবসরই বা কোথায়? বিবাহ অবশ্য সে এখনও করে নাই।
দিবারাত্রি কাজ লইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়। কি যে
তাহার কাজ তা সে-ই জানে। এত টাকাই বা তাহার আসে কোথা
হইতে?

এমনি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুদিন পরে শশীশেখর আবার

কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে তাহার এক সাহেব বন্ধু। দেখ
গেল, আফিস-অঞ্চলে চমৎকার একটি ঘর ভাড়া করিয়া তাহারা দু
বন্ধুতে এক আপিস খুলিয়া বসিয়াছে। আফিসের বাহিরে সাইন্-বোর্ড
চাপ্‌রাশি, বেয়ারা, কলিং বেল্, টেলিফোন্, মেম্-টাইপিষ্ট, কেরাণী
ভাল একটি আপিসে যাহাকিছু থাকার প্রয়োজন, কিছুরই অভাব নাই
লিমিটেড্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়া গেছে। চা ও কয়লার কারবার
সাহেব ছোকরাটি তাই লইয়াই থাকে। আর শশীশেখর শুধু ট্যাক্সি
চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আফিসে আসিয়াই টেলিফোন্ করে, মেমটিকে
ডাকিয়া চিঠি লেখায়, কোথা হইতে যে নানারকমের জিনিষের অর্ডার
লইয়া আসে কিছুই বুঝা যায় না, আবার খরিদ্দারকে জিনিষও দে
টাকাও আসে। খুব ভাল করিয়াই আফিস চলিতে থাকে।

সন্ধ্যায় দুইবন্ধুতে মেম-টাইপিষ্ট্‌টিকে ট্যাক্সিতে চড়াইয়া তাহার
বাড়ীতে গিয়া সারাদিনের পরিশ্রমের পর মদ্যপান করিয়া আমোদ-আহ্লাদ
করে। মেয়েটার নাম নোরা। বয়স বেশী নয়।

নোরার মা বলে, 'আঠারো।'

নোরার ছোট একটি ভাই আছে। দিদির বয়সের কথা উঠিলে
ছেলেটা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকে। বলে, 'মা'র মত মিথে
কথা বলতে কেউ পারে না।'

শশীশেখর জিজ্ঞাসা করে, 'কেন ?'

ছেলেটা বলে, 'তিনবছর আগে আমরা যখন ওয়াল্‌টারে ছিলাম, :
তখনও বলতো—দিদির বয়স আঠারো।'

মা এক ধমক দিয়া ছেলেটাকে চুপ করাইয়া দেয়। বলে, 'এ

ছেলেটাকে নিয়ে আমি কি যে করব মিষ্টার সেকার্, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। ওকে তোমার আফিসে নিয়ে গিয়ে একটা বেয়ারার কাজ-টাজ--'

নোরার ছোট বোনটা তখন শশীশেখরেব কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সব-কিছু গোলমাল করিয়া দেয়। বলে, 'আমায় তোমার আফিসে নিয়ে যাবে? কাল আমি দিদিব সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব। ফেরবার সময় গ্রামোফোন কিনে দিতে হবে—মনে আছে ত'?'

ছেলেটা এতক্ষণ মা'ব ধমক্ খাইয়া চুপ কবিয়া ছিল, এইবার সেও বলিযা উঠিল, 'আমার বাইক?'

শশীশেখব ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'দেবো।'

নোরাব মা বলে, 'কখ্খনো না মিষ্টার সেকার্, ওদের তুমি কিছু দিতে পাবে না। ওদের আমি এত করে' বলি, তবু দু'জনেব মধ্যে একদিনও কেউ লর্ড জেসাসেব কাছে প্রেয়ার করে না।'

শশীশেখর মৃদু হাসিয়া মা'র মুখেব পানে তাকায়। বলে, 'কি হবে প্রেয়ার করে'?'

নোবার মা সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্তাবিত করিয়া বলে, 'সে কি মিষ্টার সেকার! তুমি কি অবিশ্বাসী নাকি?'

শশীশেখর বলে, 'সেকথা কি আজ জানলেন?'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে ইজি-চেয়ারের উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসে। দেখে, ঘরের এক কোণে ড্রেসিং-টেবিলের আর্সীটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নোরা তাহার প্রসাধন শেষে সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং নানান্

ভঙ্গীতে বারে-বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহাস্যমুখে নিজেকেই ক্রমাগঃ নিরীক্ষণ করিতেছে। সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া শশীশেখর বলে, 'চেয়ারটা টেনে এনে আপনি বসুন আমার কাছে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ভগবান-টগবান কোথাও কিছু নেই ও-সব আমরা নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজেই তৈরি করেছি মানুষ শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে যে কোনো রকমে অর্থ উপার্জ্জন ক'ে আমরণ সুখে থাকবার চেষ্টা করবে। বাস্, ওইখানেই তা কর্ত্তব্যের শেষ।'

নোরার মা একবার চোখ বুজিয়া কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'আমারও এক-একসময় তাই মনে হয় মিষ্টার সেকার্। কিন্তু—

বলিয়া আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় আব একজন তরুণীকে সঙ্গে লইয়া শিশ্ দিতে দিতে শশীশেখরের বন্ধুটি ঘবে ঢুকিল, বলিল, 'রেডি ?'

নোরা হাসিতে হাসিতে লাফাইয়া লাফাইয়া একরকম ছুটিয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ইয়েস্।'

বলিয়াই সে শশীশেখরের হাতে ধরিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই টানিয়া তুলিয়া মা ও ভাই বোনের কাছে বিদায় হইয়া সকলে মিলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই বাড়ীরই আলাদা খান-দুই সুসজ্জিত গৃহে শশীশেখরের বাস-স্থান। মোটর চড়িয়া চারজনে মিলিয়া খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া নৈশ-বাসর তাহাদের সেইখানেই জমায়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নাচ

গান, হাসি, গল্প, মাতামাতি চলিতে থাকে, তাহার পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া চোখের পাতা এবং মুখের কথা যখন জড়াইয়া আসে, শশীশেখরের বন্ধু জ্যাকব, তখন তাহার বান্ধবীকে লইয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। নোরা ও শশীশেখর সেইখানেই রাত্রি কাটায়।

কিন্তু এমন করিয়া আর কতদিন!

একে ত' এক কাজ লইয়া বেশিদিন কাটানো শশীশেখরের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহার উপর ব্যবসায়ে যে অনিবার্য্য সঙ্কটের দুশ্চিন্তা সে প্রতি-নিয়তই করিতেছিল, এইবার তাহারও দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

শশীশেখরের কথাবার্ত্তা, চাল-চলন, টাকার আদান প্রদান, আফিসের জাঁকজমক দেখিয়া টাকা ধার দিতে তাহাকে কেহ কসুর করে নাই। বাজারে হুণ্ডি কাটিয়াছে প্রায় একলক্ষ টাকার। ধার করিয়া দশ হাজার টাকার জিনিষ কিনিয়াছে এবং সেই ধার করিয়া কেনা জিনিস—নগদ পাঁচ হাজার ছ'হাজার যাহা পাইয়াছে, সেই দামেই তৎক্ষণাৎ বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার হাতে আসিয়াছে নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার। অথচ ঋণ পরিশোধ করিবার দিন আসন্ন!

তবু শশীশেখরের ভয়-ডর নাই। তেম্‌নি জম্‌কালো পোষাক পরিয়া, তেম্‌নি দুই হাতে টাকা উড়াইয়া কয়েকদিন খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ট্যাক্সি চড়িয়া ঘোরা-ফেরা করিয়া কোন্‌দিক দিয়া কি যে করিয়া বসিল সেই জানে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল আফিসের দরজায় তালাচাবি পড়িয়াছে এবং কোথাকার কোন্ এক পাওনাদার, কোম্পানীকে দেউলিয়া বলিয়া নোটিশ বাহির করিয়াছে।

শশীশেখরের পাওনাদারেরা আসিয়া শশীশেখরকে আর দেখিতে পায় না। জ্যাকব্ সাহেবকে ধরিয়া বসিলে বলে, সে কিছু জানে না; ও-টার সঙ্গে তাহার বা কোম্পানীর কোনও সংস্রব নাই।

পাওনাদারেরা দেখে, সত্যই তাই। যে নামে টাকা ধার লওয়া হইয়াছে, সে নামের কোনও লোক বা সে কোম্পানীর সঙ্গে এ-কোম্পানীর কোথাও কোনও সম্বন্ধের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া দায়!

জ্যাকব্‌কে কয়েকদিন ধরিয়া যেখানে-সেখানে কিছু গালাগালি সহ্য করিতে হইল, এই যা! এবং যেদিন চা ও কয়লার কারবারের সমস্ত দায়িত্ব চুকাইয়া দিয়া জ্যাকব শশীশেখরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন সে তাহার পকেট হইতে নূতন ব্যাঙ্কের নূতন একটি চেক্-বই বাহির করিয়া সম্পূর্ণ নূতন নামের সহি করিয়া পাঁচ হাজার টাকার একখানি চেক্ কাটিয়া বলিল, 'অনেক কষ্ট দিলাম বন্ধু, এবার বিদায়।'

জ্যাকব্ বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'অর্থাৎ—?'

শশীশেখর হাসিল। বলিল, 'অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি। টাকাগুলি যতদিন আছে ততদিন অন্ততঃ বিবেকের দংশন সহ্য করে' আর একটুখানি গা-ঢাকা দিতে হবে।'

জ্যাকব্ বুঝিল যে, শশীশেখরকে এখন কিছুদিনের জন্য লুকাইয়া থাকিতে হইবে। হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু সংবাদ যেন পাই।'

'পেতে পারো।' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'এক্ষুণি যাবে? নোরার সঙ্গে একবার দেখা করে' গেলে না?'

'থাক।' বলিয়া সেই যে শশীশেখর সেখান হইতে বাহির হইয়া

ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল, তারপর কোনদিনই আর সেখানে ফিরিয়া গেল না।

যখন যেখান হইতে গিয়াছে শশীশেখর ঠিক এমনি করিয়াই গিয়াছে সত্য।

এবার শশীশেখর কোথায় গিয়া যে তাহার অজ্ঞাতবাস সুরু করিল কোনও সংবাদ কিছুদিন আমরা পাই নাই।

বহুদিন পরে দেখা গেল, মিষ্টার সেকার্ ধুতিজামা পরিয়া আবার শশীশেখর হইয়াছে এবং যেখানে সে বাস করিতেছে, মানুষ সেখানে সহজে বড় একটা কেহ যায় না। ছোট এই গলি-রাস্তাটির উপর দিনের বেলা লোক-চলাচল একরকম হয় না বলিলেই হয়, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই কেমন যেন ভোজবাজির মত ছোট এই রাস্তাটি এবং রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলির রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। কোথা হইতে কত রকমের লোক আসিয়া এই পথের উপর দিয়া চলাচল সুরু করে, নানা-বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া মেয়েরা কতক্-বা পথের ধারের রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, কতক্-বা দরজার কাছটিতে আসিয়া দাঁড়ায়, রাস্তার দু'পাশে পান বিড়ি ও চপ্ কাট্‌লেটের দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া ওঠে। হাসিতে হল্লায় নাচে গানে বিদ্রূপে বীভৎসতায় এখানকার এই নারী পুরুষে মিলিয়া দেখিতে দেখিতে কেমন যেন একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসে।

ইহারই একটি বাড়ীর এক সুসজ্জিত কক্ষে গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত প্রমোদ প্রবাহের মধ্যে দেখা গেল, মদ্যপান করিয়া ঘরের এক কোন ঘেঁসিয়া শশীশেখর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তার মেঝের উপর ঢালা

বিছানায় বসিয়া পরমা সুন্দরী তরুণী মণিমালা হারমোনিয়াম বাজাইয়া কখনও-বা গান গাহিতেছে, কখনও-বা আরও দুইজন অভ্যাগত অতিথির মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ একসময়ে শশীশেখর উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণিমালা তৎক্ষণাৎ তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'যাও কোথায় ?'

'আসছি।' বলিয়া কাপড়টা তাহার ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া শশীশেখর বলিল, 'ছাড়ো !'

মণিমালা কিছুতেই ছাড়িবে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'যেতে আমি দেবো না।'

'কেন ?'

'না। অনেক কষ্টে ধ'রে আনা হয়েছে।'

শশীশেখর বলিল, 'আমি যদি এখানে না থাকি ! বা-রে !'

মণিমালা সস্নেহে তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, 'শোনো।'

বলিয়া সে তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া খাটের উপর বসাইল। কিন্তু নিজে বসিল না। উঁচু খাট। নিজে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া, দুই হাত দিয়া শশীশেখরের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, 'যেয়ো না লক্ষ্মীটি, শোনো, গেলে কিন্তু এবার আমি মরব।'

মদের নেশায় শশীশেখরের মাথাটা তখন ঘুরিতেছে। বহুদিবসের বিস্মৃত এক বেদনার কথা সহসা তাহার মনের মধ্যে অস্পষ্ট স্বপ্নের মতই ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। সেদিনও এম্নি এক নারী তাহার বুকে

মাথা রাখিয়া ঘন অন্ধকার নিস্তব্ধ নির্জ্জনতায় নিজের মৃত্যু দিয়া তাহার ভালবাসার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। আজও হয়ত ইহাকেও সে তেমনি করিয়াই অস্বীকাব করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে তাহাব নিজের বিক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল বহু বিচিত্র জীবনের ঘাটে ঘাটে বহু শক্তি ক্ষয় করিয়া আসিয়া সে যেন একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেছে।

মণিমালাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, শশীশেখর আজ আপনা হইতেই হাল ছাড়িয়া দিয়া অসামান্যা রূপসী বারবিলাসিনীর হাতেই-আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া মনে মনে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াই বলিল, 'আচ্ছা যাও, আমি এইখানে শুয়ে থাকি মণি !'

'থাকো ' বলিয়া মণিমালা ধীরে ধীরে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। কিন্তু শোয়াইয়া দিয়াই নিশ্চিত হইল না। মাথার নীচে একটী বালিস রাখিয়া, সস্নেহে তাহাকে একটী চুম্বন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ে দরজার শিকলটা টানিয়া দিয়া গেল এবং এ-ঘরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'দেরি হয়ে গেল একটু, কিছু মনে করবেন না যেন।'

১০

শশীশেখরের জীবনের এ অধ্যায়টি আরও কদর্য্য, আরও কুৎসিত; কিন্তু এ অধ্যায়টি বাদ দিলে তাহার জীবনের অনেকখানি বাদ পড়িয়া যায় বলিয়া ইহাও আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মণিমালা সুন্দরী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্য তাহার চেয়েও অনেক সুন্দরী শশীশেখর দেখিয়াছে, তবু কেন যে সে এখানে আসিয়া এমন করিয়া ধরা দিল কে জানে।

মণিমালা ছাড়া শশীশেখরের একদণ্ড [illegible] না। দিবারাত্রি তাহাকে সে তাহার চোখের সুমুখে দেখতে চায়। বলে, 'না তুমি কোথাও যেতে পাবে না মণি, তুমি এসো।'

মণিমালা হাসে। বলে, 'বেশ, তবে দু'জনে এমনি মুখোমুখি বসে' থাকি।'

শশীশেখর বলে, 'হ্যাঁ, থাকো'।

দু'জনেই প্রাণপণে মদ খায়। মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকে।

মণিমালার বৃদ্ধা মাতার দাঁত ভাঙিয়াছে, চুল পাকিয়াছে, চোখে ভাল দেখিতে পায় না,—কিন্তু এখনও মরে নাই। তেতলার ছাদের দক্ষিণ দিকে ছোট একটি কুঠুরিতে দিবারাত্রি সে তাহার সাধনভজন লইয়াই থাকে, নামাবলী গায়ে দিয়া মালা জপ করে, পিতলের কমণ্ডলুটি হাতে লইয়া দুপুরে গঙ্গাস্নান করিয়া আসে, মাটির একটি তোলা উনানে স্বপাক

রান্না করিয়া খায়, মেয়ে তাহার দোতালায় কি করিতেছে সে-সব খবর বড় একটা রাখে না।

পাড়ার আর-একজন অমনি বৃদ্ধা প্রায় প্রত্যহই তহার কাছে আসিয়া বসে। তাহারই সঙ্গে গল্প করিতে কবিতে শীতকালের বেলা—অতি সহজেই কাটিয়া যায়

কত রকমের কত গল্প যে তাহাদের হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

মণিমালা'র মা সেদিন তাহার বিগত যৌবনের অপরিমেয় রূপ ও ঐশ্বর্য্যের কথাই বলিতেছিল। বলিতেছিল, 'আমার মা আমার নাম রেখেছিল এলোকেশী। বুঝলে সুখদা? এলোকেশী কেন বলতে জানো? ওই আমার মণিমা'র মত অমনি বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল —পিঠ ছাপিয়ে একেবারে আমার এই পায়ে এসে' পড়তো—'

ঝি আসিয়া খবর দিল,—'গিন্নিমা, দিদিমণি আজ সারাদিন কিছু খায়নি। বাবুর সঙ্গে আবার সেই তেম্‌নি ক'রে—'

এলোকেশীর চুলের গল্প আর শেষ হইল না। বলিল, 'ওই দ্যাখ মাইরি, ওই এক জ্বালা হয়েছে আমার সুখদা! এত করে' বলি মেয়েটাকে যে, যা করিস্‌ তা করিস্‌, নিজের কাজের বেলায় ঠিক থাক্‌। এই বয়সে যদি অম্‌নি পেরেম্‌-পীরিত্‌ ক'রে কাটাস ত' বয়েস্‌ পড়লে কেউ খেতে দেবে না, ওই দেহির ওপরেই সব্বস্ব, তা ও কিছুতেই শুনবে না। কোত্থেকে এক ছোঁড়া এসে' জুটেছে, জানি ও-সব বড়লোকের ছেলে— বাপের টাকাকড়ি চুরি-চামারি ক'রে নিয়ে এসে দুদিন ফুর্ত্তি করে, টাকা ফুরোলেই—সুখের পায়রা ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে' যায়,—না কি বল সুখদা, ও আমরা কত দেখেছি। চল্‌—দেখি আবার……

বলিতে বলিতে এলোকেশী উঠিয়া দাঁড়াইল। শহরের উপর শীত-সন্ধ্যার ধূমল অন্ধকার তখন সবেমাত্র নামিয়া আসিতেছে। ঝি বলিল, 'দাঁড়াও মা, সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দিই, অন্ধকারে নামতে তোমার কষ্ট হবে।'

বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

এলোকেশী ও সুখদা দু'জনেই ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়া গিয়া দেখে, মণিমালা তখন উঠিয়া বসিয়া গায়ে একখানা দামী শাল জড়াইয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ঝিমাইতেছে, আর শশীশেখর আবার মদ্যপান সুরু করিয়াছে। ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবার জায়গা নাই। মদ, বিয়ার ও সোডার বোতল, শালপাতার ঠোঙা, ভুক্তাবশিষ্ট থালা, পান-মোড়া কলাপাতা' আধপোড়া সিগারেট—সর্ব্বত্রই ইতস্ততঃ ছড়ানো, কেমন যেন একটা বিশ্রী উৎকট দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেছে।

এলোকেশী চৌকাঠের এপাশ হইতেই ডাকিলেন, 'শ্যামা!'

ঝি কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'কি মা?'

'বলি, দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ বাছা, ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে ফ্যাল্! ও নবাবের মেয়ে ত' আর মুখ ফুটে কিছু বলবে না।'

শ্যামা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া সেগুলা সব এদিক-ওদিক সরাইয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল।

মা'র কথা শুনিয়াই মণিমালা বুঝিয়াছিল—মা রাগিয়াছে। বলিল, 'তুমি আবার কি জন্যে এলে মা?'

অতি সাবধানে এলোকেশী ঘরে ঢুকিল।

সুখদা বলিল, 'রাত হয়েছে তা' হলে দিদি আমি যাই।'

হ্যাঁ এসো।' বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া এলোকেশী তাহার মেয়ের কাছ হইতে একটুখানি তফাতে বসিয়া বলিল, 'এলুম কি জন্যে জিজ্ঞেস করছিস ? জানতে এলুম—বলি তোর এম্‌নি চিরকাল চলবে কি না—যাক্‌, মর্‌,তোর যা-খুসী তাই কর্‌, দে আমার টাকা দে।'

বলিয়া সে তাহার শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া বলিল, 'দে, শীগ্‌গিরি দে মা, আমি চলে' যাই।'

এলোকেশীকে দেখিয়া শশীশেখর তাহার হাতের গ্লাসটি নামাইয়া ওদিকের জানালার কাছে গিয়া সিগারেট টানিতেছিল। মণিমালা একবার বালিসের নীচেটা হাত্‌ড়াইয়া দেখিল, সেখানে একটা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা পড়িয়া আছে মাত্র। তখন সে অগত্যা শশীশেখরের কাছে উঠিয়া গিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ ম্লানমুখে কহিল, 'মা টাকা চাচ্ছে।'

'টাকা ? কত টাকা ?'

মণিমালা হাসিল। সে বড় চমৎকার হাসি! যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝানো কঠিন। মা শুনিতে না পায় এমনভাবে ধীরে ধীরে বলিল, 'আবার সেই কথা ? শেষে কি টাকা দিয়ে আমায় কিন্‌তে চাও ?

শশীশেখর সহসা যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চুপ করিল। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো তাহার জামাটার কাছে আগাইয়া গিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিল, টাকা সেখানেও নাই। বলিল, 'একশ' আজ এনেছিলাম। সবই কি ফুরিয়ে গেল নাকি ? কাল দিলে হবে না ?'

মণিমালা বলিল, 'দাঁড়াও আমি নিজের টাকা এনে দিচ্ছি।'

বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া খুব খানিকটা সাড়াশব্দ করিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিতে বসিল।

এলোকেশীও কোন্ সময় চুপি চুপি তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিতান্ত নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল 'আমি বাছা কিছু বুঝতে পারছি নে। কিরকম বুঝছিস বল দেখি?'

মণিমালা চীৎকার করিয়া উঠিল—'তুমি বেশী চেঁচিও না মা, তোমার টাকার দরকার, টাকা পেলেই হ'লো, অত সব খোঁজখবরে তোমার—'

বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই মা'র মুখের পানে একবার তাকাইয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া সে এঘরে আসিয়া খান চার পাঁচ দশ টাকার নোট শশীশেখরের হাতে গুঁজিয়া দিয়া চুপিচুপি বলিল, 'কাল সকালের জন্য গোটাদশেক টাকা হাতে রেখে বাকী টাকা তুমি দিয়ে দাও মাগীকে।'

এই বলিয়া সে জানালার কাছে একটুখানি সরিয়া বেশ জোরে জোরেই বলিতে লাগিল, 'বাবা রে বাবা! খালি টাকা আর টাকা নিয়েই যেন সম্বন্ধ!—ওই নিয়ে যাও মা, দুদিন আরচেয়ো না বলে' দিচ্ছি!'

নোটগুলি হাতে লইয়া এলোকেশী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মণিমালা তৎক্ষণাৎ হড়াম্ করিয়া সশব্দে দরজায় খিল বন্ধ করিয়া আসিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল 'না আর এমন করে' পারব না আমি। ওগো শুনছো? চল আমরা এখান থেকে পালাই।'

শশীশেখর প্রস্তুত। কাছে আসিয়া বলিল, 'সে ত' তোমায় আগেই বলেছি মণি!'

বলিয়াই সে বসিল। বলিল—'আমিও আর পারছিনে মণিমালা সত্যই বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। বেশ হবে। চমৎকার একখানি বাড়ীতে গিয়ে তুমি আর আমি,—দু'জনে স্বামীস্ত্রীর মত আজীবন—'

কথাটা তাহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই বন্ধ দরজার বাহিরে কে ঘন-ঘন কড়া নাড়িতে লাগিল।

মণিমালা বলিল, 'কে ?'

বাহির. হইতে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।—'খোলো। আমি নিবারণ।'

মণিমালা বলিল, "শোনো! বাবা বে বাবা! এই সব উপদ্রবের হাত থেকে কবে নিষ্কৃতি পাব রে বাবা!'

বলিয়া সে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, 'আমার শরীর ভাল নয় ভাই, তুমি যাও।'

তাহার পর দরজাটা বাহির হইতে একটুখানি টানিয়া দিয়া। শশি-শেখরকে আড়াল করিয়া নিবারণকে কি যে সে বলিল, কিছুই বুঝা গেল গেল না। খানিক পরে ভিতরে আসিয়া দরজাটা আবার সে বন্ধ করিয়া দিল।

'কি ভাবছ ?'

শশিশেখর বলিল, 'কালই চল' আমরা চলে' যাই এখান থেকে।'

'কোথায় যাবে ?'

'আর-একটা বাড়ীতে।'

মণিমালা বলিল, 'তারপর ? কিছুদিন পরে তুমিও পালাবে ত ?'

'তোমার কি তাই মনে হয় ?'

'পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস আমি করি না। আমি না ধরে' রাখলে তুমি এতদিন হয়ত' পালাতে।'

শশিশেখর বলিল, 'কি দুঃখে যে পালাতে চেয়েছিলাম তা'ত তুমি জানো। আমি তোমায় স্ত্রীর মত আপনার ক'রে পেতে চাই' তোমায় নিয়ে ঘর-সংসার করতে চাই।'

আর আমি বুঝি—' বলিয়া মণিমালা তাহার চোখে-মুখে ঠিক

বিদ্যুতের মত একটুখানি হাসির আভাস দিয়া বলিল, 'যাও। তুমি আর কথা বোলো না। আমি কি করছি তোমার জন্যে দেখতে পাচ্ছ না?'

শশিশেখর বলিল, 'ছাখো মণি, একটা সত্যি কথা বলি শোনো জীবনে অনেকগুলি মেয়ে আমি দেখেছি। পুরুষকে জয় করবার কত রকমের কত অদ্ভুত কলাকৌশল যে তোমরা জানো তার আর অবধি নেই তাই একবার আমার মনে হচ্ছে, তুমিও যদি সেইরকম কিছু ক'রে থাকো ত' আমায় ছেড়ে দাও। কারণ আমি জানি, ও বেশীদিন টি'কবে না। তবে যদি সত্যিই তুমি আমার জন্যে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতে রাজী আছ, তাহ'লে চল—আমরা দু'জনে কোথাও স্বখস্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিগে, নইলে—বৃথা চেষ্টা।'

মণিমালা একটা বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল।

শশিশেখর বলিল, 'চুপ ক'রে রইলে যে? জবাব দাও?'

মণিমালা জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিল না।

শশিশেখর তখন আপনমনেই বলিতে লাগিল, 'কেন যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো কে জানে। তোমায় যদি সত্যিই না পাই, তা'হলে আমার দুঃখের আর অবধি থাকবে না।—ওকি! তুমি কাঁদছ মণি?'

দেখিল, মণিমালা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। হাত দিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া শশিশেখর বলিল, 'ওঠো, ছি! কেন, কান্না কিসের জন্যে?'

মণিমালা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, 'না, তুমি যাও, সেই ভালো, তুমি যাও।'

'সে কি? কেন আমি যাব কেন?'

মণিমালা বলিল, 'না'। আমায় যখন তোমার এত অবিশ্বাস, তখন আর আমি তোমায় থাকতে বলব না।'

'না—না অবিশ্বাস নয় মণি···তুমি আমায়—'

হাত নাড়িয়া মণিমালা বলিল, 'থাক্। চুপ কর। আমি বুঝেছি। মি যাও, তারপর দ্যাখো আমি কি করতে পারি।'

বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

শশিশেখর অনেক বলিল, অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু কোনও কারেই তাহার কান্না চুপ করাইতে না পারিয়া শেষে নিজেও একসময়ে হারই পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন কত কে জানে, শশিশেখরের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, ণমালা তাহার শিয়রেব কাছে বসিয়া চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইয়া হাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

গভীর নিশুতি রাত্রে তাহারও অজ্ঞাতে মণিমালার এই নীরব সেবা, শশেখরের অত্যন্ত ভাল লাগল। হাত বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া রিয়া বলিল, 'মণি, তুমি—তুমি—? এত রাত্রে বসে' আছ?'

মণিমালা চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর সেই অন্ধকার ঘরে অন্ধ প্রেমিক শশিশেখর মণিমালাকে চক্ষণ কলাকুশলী ছলনাময়ী নারী বলিয়া আঘাত দিবার জন্য ক্ষমা হিল এবং তৎক্ষণাৎ সে ইহাও স্থির করিয়া ফেলিল, আগামী সপ্তাহের ধ্য এই কলিকাতা শহরে মণিমালার নামে সে একখানি সুসজ্জিত বাড়ী নিয়া সেইখানে গিয়াই তাহারা স্বামীস্ত্রীর মত গোপনে বাস করিবে।

মণিমালা বলিল, 'মা যেন কিছু না জানতে পারে। জানলে সে মায় যেতে কিছুতেই দেবে না।'

শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিল, 'তা'লে তুমি কি তোমার মা'র সঙ্গেও বনে আর কোনোদিন দেখা করতে চাও না?'

মণিমালা হাসিল। বলিল, 'পাগল! মা'ই ত' আমার এই দশা করেছে। তবে শেষ বয়েসে তা'র কষ্ট যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করে' দিয়ে গেলাম।'

শশিশেখর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

মণিমালা বলিল, এ বাড়ীখানা মা নিজেই করেছেন, তা'ছাড়া আমার উপার্জ্জনের যা'কিছু সবই ত' রইলো। জীবনের শেষ ক'টা দিন তা'র তাতেই চলে' যাবে।'

শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিল, 'আর আমাদের? আমাদের কেমন করে' চলবে মণি?'

মণিমালা হাসিল। বলিল, 'চেক্-বইটা ত' আমার কাছে, একখানা চেক্ তুমি সই ক'রেও রেখেছ। সে ব্যবস্থা আমি করব, তোমায় ভাবতে হবে না।'

শশিশেখর বলিল, 'এর মধ্যে ব্যাঙ্কে যদি আমি বারণ ক'রে দিয়ে থাকি?'

'বেশ ত' তা'হলে আমার যা সম্বল আছে তা' আমায় এখান থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে হবে। তোমার যদি কিছু না থাকতো, তা'হ'লে কি মনে করছ তুমি—'

এখনই হয়ত অবিশ্বাসের কথা আসিয়া পড়িবে ভাবিয়া শশিশেখর হাত বাড়াইয়া মণির মুখ চাপা দিয়া বলিল, 'থাক্ আমি জানি।'

'ছাই জানো স্বার্থপর পুরুষ'—

'আবার!' বলিয়া আর একটুখানি জোরে চাপা দিয়া সে মণিকে চুপ করাইয়া দিল।

এক সপ্তাহ লাগিল না।

দেখা গেল, মণিমালার নামে শশিশেখর একখানি বাড়ী কিনিয়াছে

এবং ইহারই মধ্যে বাড়ীখানি ভদ্রভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তাহারা দুইজনে সেখানে স্বামীস্ত্রীর মতই বাস করিতেছে।

পুরাতন বাড়ী হইতে আসিবার সময় মণিমালা সঙ্গে তাহার কিছুই আনে নাই। এখানে আসিয়া সবই আবার নূতন হইয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দাসী চাকর সবই নূতন।

শশিশেখরকে সঙ্গে লইয়া মণিমালা প্রত্যহ বৈকালে মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়। ফিরিয়া আসিয়া গ্রামোফোন বাজায়। বামুন-ঠাকুর রান্না করিয়া প্রথমে বাবুর খাবার ধরিয়া দিয়া যায়। মণিমালা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়ায়। আদর করে, যত্ন করে।

বাড়ীর জন্য আরও কয়েকটা কি সব আসবাবপত্র কিনিতে শশিশেখর সেদিন একাকী বাহির হইয়াছিল। পথে তাহার একজন মাড়োয়ারী পাওনাদারকে দেখিয়া অতিকষ্টে তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া চোরের মত আত্মগোপন করিয়া সে বাড়ী ফিরিল।

ফিরিয়াই বলিল,—'দ্যাখো মণি, আমার মনে হচ্ছে, কলকাতা ছেড়ে চল আমরা অন্য কোথাও বাড়ী ঘর তৈরি ক'রে থাকি গিয়ে।'

'কোথায় ?'

'যেখানে হোক্। অন্য কোনও ছোট খাটো শহরে, যেখানে কেউ আমাদের চেনে না!'

মণিমালা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, 'বেশ।'

ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকাই তুলিয়া আনা হইয়াছে। সবই এখন মণিমালার হাতে।

কিছু টাকা চাহিয়া লইয়া শশিশেখর তাহার পরের দিনই বাড়ী হইতে বাহির হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'ফিরতে যদি দেরি হয়ত ত' তুমি ভেবো না।'

মণিমালা সজল চক্ষে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বেশি দেরি কোরো না।'

দু'দিন পরে পশ্চিমের কোন্ একটা শহর হইতে মণিমালা একখানি চিঠি পাইল। শশিশেখর লিখিয়াছে, 'ফিরিতে হয়ত কিছু বিলম্ব হইতে পারে। তুমি যেন চিন্তিত হইও না। ভাল আছি।'

কিন্তু কে জানিত, তাহার পরের দিনই শশিশেখর ফিরিয়া আসিবে।

একখানি চমৎকার বাড়ী সেখানে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। অবিলম্বে টাকা দিয়া সেখানি কিনিয়া না ফেলিলে পাওয়া যাইবে না। তাই সে মহা উৎসাহে টাকা লইবার জন্য কলিকাতায় ফিরিল।

সবে তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সে উপরে উঠিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রথম বাবান্দায় দেখিল, ও-বাড়ীর শ্যামা ঝি দাঁড়াইয়া আছে। একটুখানি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই এখানে?'

শ্যামার মুখ দিয়া সহসা জবাব বাহির হইল না। মাথায় কাপড়টা সলজ্জ সঙ্কোচে টানিয়া দিয়া সে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল মাত্র।

শশিশেখর ভাবিয়াছিল, মণিমালার মা হয়ত টের পাইয়া শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছে। তাই সে একটুখানি ভয়ে-ভয়ে পা টিপিয়া ঘরের দরজার কাছে আগাইয়া গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে যে অদ্ভুত দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহা সে দেখিবে বলিয়া কল্পনাও করে নাই। দেখিবামাত্র শশিশেখরের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। চোখের সুমুখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতে লাগিল: দেখিল,—আর্শী-দেওয়া টেবিলের উপর দুইটা মদের বোতল নামানো এবং অদূরে তাহারই শয্যার উপর মত্ত অবস্থায় নিবারণ শুইয়া শুইয়া আবোল্-তাবোল্ কি যেন বকিতেছে আর তাহার বুকের উপর আলুলায়িতকুন্তলা মণিমালা!

১১

শশিশেখরের মাথার রক্ত নিমেষেই গরম হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বোতল তুলিয়া লইয়া কাহার উদ্দেশে যে ছুঁড়িয়া মারিল, নিজেও ঠিক টের পাইল না, বোতলটা নিবারণের মাথায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং শুধু বোতল ভাঙ্গিল না, নিবারণের মাথাও ভাঙ্গিল। 'উঃ' বলিয়া একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া বসিতে গিয়া সে সেইখানেই টলিয়া পড়িল। গল্‌গল্‌ করিয়া তাহার মাথা হইতে কাঁচা রক্ত গড়াইয়া সাদা বিছানা তৎক্ষণাৎ রাঙা হইয়া গেল। মাথার আর-একদিক হইতে পিচকারির মুখে জলের মত রক্তের একটি অতি সূক্ষ্ম ধারা ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া সবেগে বাহির হইয়া খাটের উপরে-তোলা সাদা মশারিটা ভিজাইয়া দিতে লাগিল। মণিমালা তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া শশিশেখরকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু শশিশেখরের মাথায় তখন খুন চাপিয়াছে, সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'শয়তানী করবার আর জায়গা পাওনি—বেশ্যা হারাম……বলিয়া কথাটা তাহার আর শেষ না করিয়াই সে টেবিল হইতে আর-একটা মদের বোতল তুলিয়া লইয়া মণিমালার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। মণিমালার সৌভাগ্য, বোতলটা তাহার মাথায় লাগিল না, খাটের একটা পায়ে লাগিয়া সশব্দে ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া সেইখানেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

মণিমালা সেই অবসরে ছুটিয়া পলায়ন করিল এবং বাহির হইতে দরজার হুক্‌টা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

খুব বেশি চীৎকার করিবার প্রয়োজন হইল না। কাণ্ড কারখানা

দেখিয়া শ্যামা ঝি পূর্ব্বাহ্নেই পুলিশ ডাকিবার জন্য ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া হাজির হইয়াছিল।

টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া মণিমালা তখন সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে দুইজন পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে শ্যামা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

এবং তাহার পর কি হইল, সেকথা আর না বলিলেও চলে।

শশিশেখরকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুলিশ হাজতে পুরিয়া রাখিল। নিবারণ গেল হাঁসপাতালে এবং মণিমালা পুলিশের কাছে এই বলিয়া তাহার জবানবন্দী পেশ করিল যে, এই শশিশেখর লোকটার দায়ে জীবন তাহার একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন হইতে সে তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায় এবং শুধু ঘুরিয়া বেড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় না, একবার তাহার ঘরে আসিয়া বসিলে একাদিক্রমে দিনের পর দিন আর সেখান হইতে নড়িতে চায় না, মদ খাইয়া হল্লা করিয়া লোকজনকে আসিতে না দিয়া সে তাহার ব্যবসার বহু ক্ষতি করিয়াছে। সম্প্রতি উহারই জ্বালায় সে একেবারে তিক্তবিরক্ত হইয়া গিয়া ও পাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া এখানে এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এখানে আসিয়াও নিস্তার নাই, কিছুদিন হইল কোথায় সে চলিয়া গিয়াছিল আজ রাত্রে কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়াই বলে যে, ওই লোকটাকে (নিবারণকে) বিদায় করিয়া দেওয়া হোক্। মণিমালা তাহাতে রাজী হয় নাই এবং সেই রাগেই তৎক্ষণাৎ একটা বোতল তুলিয়া শশিশেখর নিবারণকে মারিয়া বসে! তাহাকেও ঠিক অমনি করিয়াই জখম্ করিয়া ফেলিত; কিন্তু সে পলায়ন করিয়া বাহির হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে।

শশিশেখর অবাক্!

পথশ্রমে এবং মানসিক উত্তেজনায় মাথা তুলিয়া তাকাইতে পারিতে-ছিল না, তবুও সে একবার অতি কষ্টে মণিমালার মুখের পানে তাকাইল। মণিমালা কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া স্মিতহাস্যে ইন্সপেক্টরবাবুকে একটি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা এবার তা'হলে যেতে পারি ?'

ইন্সপেক্টরবাবু তাঁহার হাতের কলমটি মণিমালার হাতে তুলিয়া দিয়া খাতাখানি দেখাইয়া বলিলেন, 'এইখানে একটি সই ক'রে দিয়ে যান।'

মণিমালা হেঁটমুখে তাড়াতাড়ি তাহার নামটি লিখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

থানার বাহিরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল। শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া হাসিতে হাসিতে চড়িয়া বসিতেই সশব্দে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ছয়দিনের দিন হাঁসপাতালে নিবারণ মারা গেল।

তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অবধি শশিশেখরের মনে আর বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না। বেচারা নিবারণ! বোতলটা ছুঁড়িয়াছিল সে মণিমালাকে মারিবে বলিয়া, নিবারণকে মারিবার জন্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, দ্বিতীয়বারেও মণিমালার গায়ে এতটুকু চোট লাগিল না, অক্ষতদেহে তাহারই চোখের সুমুখে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর প্রাণ হারাইল নির্দ্দোষ নিবারণ।......উন্মাদের মত শশিশেখর সেই অপরিসর হাজতঘরের মধ্যে বিভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ একসময়ে দরজার একটা লোহার শিক্ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে লোহার নাল-বাঁধানো ভারি বুটজুতার শব্দ হইতেছে। সঙ্গীন্-ওয়ালা বন্দুক ঘাড়ে লইয়া গালপাট্টাওয়ালা সিপাহী একজন

পাহারায় নিযুক্ত। তাহারই সঙ্গে একই ঘরে আরও তিনজন আসামী দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল।

আজ তাহার মোকদ্দমার দিন। তাহাকে আদালতে লইয়া যাইবার জন্য সাঁজোয়া গাড়ীটা কতক্ষণে আসিবে, শশিশেখর বাহিরের পানে একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল।

আজ সে নিঃসহায়। মণিমালা তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। যে মণিমালাকে ভালবাসিয়া সে তাহার সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছিল, সেই মণিমালা! সুন্দরী মণিমালা, নারী মণিমালা!...

আদালতের মকদ্দমা চুকিতে বিশেষ দেরী হইল না।

একদিকে শশিশেখর একা, অন্যদিকে সমগ্র রাজশক্তি, মণিমালার মত নারী এবং শশিশেখরেরই দেওয়া অর্থসম্পদ!

শশিশেখর প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে দোষী সাব্যস্ত করিবার প্রাণপণ চেষ্টার বিরুদ্ধে সে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিল না। মণিমালা যাহা বলিল, সহাস্যমুখে তাহাই সে সমর্থন করিয়া বিচারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

হাকিম রায় প্রকাশ করিলেন—সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড!

এতক্ষণ পরে শশিশেখর তাহার ঠোঁছের ফাঁকে ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া মণিমালার মুখের দিকে একবার তাকাইল। মনে মনে বলিল, 'চমৎকার!'

বলিয়াই সে বিশ্বের নারীজাতিকে একটি নমস্কার করিয়া প্রহরীর উদ্যত লৌহ-বন্ধনীর দিকে নিজের হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল।

খুনে আসামী শশিশেখর জেল খাটিতেছে। গায়ে কয়েদীর পোষাক গলায় নম্বর-দেওয়া তক্তি, পাছে পলাইয়া যায় ভাবিয়া পায়ে লোহার শৃঙ্খল।

পায়ের এই লোহার শিকলটার পানে তাকাইলে শশিশেখরের হাসি পায়। সম্প্রতি এখান হইতে পলায়ন করিবার কোনও ইচ্ছাই তাহার নাই। রাত্রির অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে শুইয়া শুইয়া শশিশেখরের মনে হয়, এত দিন পরে সে যেন একটুখানি বিশ্রামের অবসর পাইযাছে। নিজেকে সব-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটুখানি ভাবিবার অবসর! বিগত জীবনের প্রত্যেকটি দিবসের খুঁটিনাটি ইতিহাস আজ হয়ত তাহার আর মনেও নাই; কিন্তু এইটুকু শুধু সে জানে যে, কিসের যেন একটা দুর্দ্দমনীয় পিয়াসা লইয়া উল্কার মত প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। চলিয়াছিল হয়ত' সে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে; কিন্তু কোন্ অদৃশ্য বিধাতা তাহাকে আজ দণ্ড দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কে জানে! বিধাতায় বিশ্বাস তাহার ছিল না, আজও সে এত সহজে বিশ্বাস হয়ত' করিত না; কিন্তু এই মর্ত্ত্যের মানুষ যে আর একটি অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে চিরদিনের জন্য বাঁধা, আজ যেন তাহা সে তাহার সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব কারতেছে।

অর্থসম্পদেব জন্য দুঃখ তাহার নাই। এমন বহু অর্থ যেমন সে উপার্জ্জন করিয়াছে, আবার তেমনি তাহা নিতান্ত অবহেলায় ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয নাই; তাহা ছাড়া অপরকে ফাঁকি দিয়া অসদুপায়ে যাহা সে একদিন হস্তগত করিয়াছে, তাহাকেও আবার তেম্‌নি অপরে ফাঁকি দিয়া সে-অর্থ যদি আত্মসাৎ করে ত' তাহার জন্য অনুতাপ করিবার মত মন তাহার নয়।

শশিশেখর এখন ভাবে যে, সে তাহার জীবনে কি চাহিয়াছিল এবং তাহা সে সত্যই পাইয়াছে কি না। মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজন—সকলের স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি শৈশবেই ভগবান তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছেন। স্নেহের কাঙ্গাল শশিশেখর সেই তখন হইতে

শুধু তাহারই সন্ধান করিয়াছে। যদিই-বা কোথাও কিছু পাইয়াছে ত' নানা বাধা-বিপত্তির মাঝে সেইটুকুও ভাগ্যে তাহার চিরস্থায়ী হয় নাই। না পাইয়া সে বিদ্রোহ করিয়াছে। সব দিক দিয়া জীবনটাকে উপভোগ করিতে গিয়া এমন-সব কাজ সে করিয়াছে, যাহা করিবার পর এক সময়ে সে নিজেই অবাক্ হইয়া ভাবিয়াছে, ইহা সে করিল কেমন করিয়া! বহু বিচিত্র জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের জীবনের তরীখানি বাঁধিয়া বাঁধিয়া অভিজ্ঞতাও সে কম সঞ্চয় করে নাই।

তাহার পরেই আসিয়াছে মণিমালা, সুচতুরা মণিমালা! অভিনেত্রী মণিমালা! অভিনেত্রীই বটে!

শশিশেখরের মত কুশলী অভিনেতার চোখে ধুলা দিয়া এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে তাহাকে আর কেহই পারে নাই। বাল্যাবধি স্নেহ-বঞ্চিত শশিশেখরের অন্তরে যে দুর্ব্বার ক্ষুধা সঞ্চিত হইয়াছিল মণিমালা কেমন করিয়া যে টের পাইয়াছিল কে জানে এবং শুধু টের পাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে নাই, যত রকমে যেমন করিয়া পারিয়াছে তাহার সে-ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া শশিশেখরের হৃদয়ে নিজের আসন কখন্ কোন অলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আজ শশিশেখরের দুঃখ শুধু তাহারই জন্য! অভিনয় করিয়া যে জয়ী হইয়াছে, না জানি তাহার সত্যকারের প্রকাশ কেমন!

কলাকুশলী এই বিজয়িনী নারীর কাছে শশিশেখর সত্যই পরাজিত। তাহা না হইলে আজ এই এত প্রবঞ্চনার পরেও তাহাকে সে ভুলিতে পারে না কেন? ভুলিবার চেষ্টাও ত' সে কম করে নাই! তাহার মিথ্যাচার, তাহার প্রবঞ্চনা, তাহার অভিনয়ের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া প্রথম কয়েকদিন ধরিয়া মণিমালার বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ শশিশেখর সঞ্চয় করিয়াছিল,—যতই দিন যাইতে লাগিল, পুঞ্জীভূত সে ঘৃণা ও বিদ্বেষের

গ্লানি কেমন করিয়া কোন্ অলক্ষ্যে যে তাহার অন্তর হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতে লাগিল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

জেলের দুই বৎসর তখনও কাটে নাই।

নিত্য প্রভাতে এবং সন্ধ্যায় বন্দী শশিশেখর তাহার কারাকক্ষের নির্জ্জনতায় বসিয়া হাতদুইটি জোড় করিয়া চিন্তিত-নেত্রে ঊর্দ্ধে শূন্য বায়ুস্তরের মধ্যে কোন্ অলক্ষ্য বিধাতার কাছে তাহার ঐকান্তিক প্রার্থনা জানায়—নিরীহ নির্দ্দোষ নিবারণকে হত্যা করার জন্য তাহাকে ক্ষমা কবিও, আর ক্ষমা করিও সেই নির্ব্বোধ মণিমালাকে—না জানিয়া যে-অভাগী তাহার সুপবিত্র ভালবাসাকে এমন নিদারুণভাবে অপমানিত করিয়াছে!

শশিশেখর প্রার্থনা করে, আর দুচোখ বাহিয়া তাহার অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসে। প্রার্থনায় যে এত শান্তি, বিশ্বাসে যে এত আশ্বাস; ইহার পূর্ব্বে কোনদিনই তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই।

ক্রমে এমন হইল যে, শশিশেখরের চোখে সারারাত্রি ধরিয়া আর ঘুম আসে না। চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া এই বহুবিস্তৃত পৃথিবীর অসংখ্য নরনারীর সুখ দুঃখের কথাই ভাবিতে থাকে। পৃথিবীতে যেন সুখ আর দুঃখ, এই দুইটি বস্তু ছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই! আলো আর অন্ধকারের মত ওই দুইটি বস্তু যেন নিখিল নর-নারীর অন্তরের অন্তরের উপর ক্রমাগত ছায়া ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরিমিত কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই পরমায়ু আবদ্ধ; তথাপি এই গণ্ডীবদ্ধ ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জীসনের যে কয়টি দিবস মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, একমাত্র নিজের সুখ আর দুঃখের চিন্তাই তাহাদের অভিভূত করিয়া রাখে।

জেলেব মধ্যে কত রকমের কত কয়েদী আসে আর যায়। প্রত্যেকেই

একটা না একটা কিছু অপরাধ করিয়া আসে। সুযোগ পাইলেই শশি-শেখর তাহাদের অন্তরের কথা জানিবার চেষ্টা করে। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি কয়েদীর সঙ্গে সে আলাপ করিয়াছে, সুখ দুঃখের সেই চিরন্তন সমস্যা ছাড়া আর কিছুই সে শোনে নাই। কেহ বা সুখের আশায় দুঃখকে বরণ করিয়াছে, আবার কেহ বা দুঃখ হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য না জানিয়া না বুঝিয়া মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় আরও বড় দুঃখকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

কত মানুষের কত দুঃখ-বেদনার কত বিচিত্র কাহিনী! তাহাদের তুলনায় শশিশেখরের দুঃখ কতটুকুই বা!

সেদিন রবিবার। কয়েদীদের জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা হইয়াছে। অসংখ্য জীবন্ত কই মাছ। একটি একটি করিয়া সেগুলিকে মারিয়া কুটিবার ব্যবস্থা করিতে গেলে অনেক সময় লাগে; কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়—প্রকাণ্ড একটা চৌবাচ্চার মধ্যে মাছগুলিকে ফেলিয়া ফুটন্ত গরম জল তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া।

গরম জল ঢালিবার হুকুম হইয়াছে শশিশেখরের উপর। ফুটন্ত গরম জলের বাল্‌তি হাতে লইয়া চৌবাচ্চার উপর সে বসিয়া আছে—কিছুতেই আর ঢালিতে পারে না! একবার একটুখানি ঢালিয়া দেখিয়াছে—প্রাণের ভয়ে মাছগুলার সে কী ছট্‌ফটানি! ছুটিয়া তাহারা এক জায়গায় জড়ো হইয়াছে। মরিতে তাহারাও চায় না।

শঙ্কর বলিয়া একজন কয়েদীর সঙ্গে গত কয়েকদিন হইল শশিশেখরের পরিচয় হইয়াছে। দেখিল, সে দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

শশিশেখরের চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতেছিল। শঙ্করের দিকে তাকাতেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া বলিল,—'পারছিনে ভাই!'

'দাও।' বলিয়া কাছে আগাইয়া আসিয়া শঙ্কর তাঁহার হাত হইতে বাল্‌তিটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'তুমি না খুনে আসামী ?'

শশিশেখর ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'হ্যাঁ।'

দিব্য নির্ব্বিবাদে পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে বাল্‌তিব পর বাল্‌তি গরম জল আনিয়া শঙ্কর সেই মাছগুলিব উপব ঢালিয়া দিল। বলিল,—'এতে আর কিছু হয় না শশিশেখর. নিজেব হাতে স্ত্রীকে খুন করেছি, দুটো ছেলে, একটা মেয়ে—একই বিছানায—একই রাত্রে। একটা ছেলে চীৎকার করে' উঠেছে, আব একটাব টুঁটি চেপে ধরেছি, দশবছরেব বিবাহিতা স্ত্রী আমাব—মুখখানি যার একদণ্ডের জন্যে না দেখলে অস্থিব হ'য়ে উঠতাম, যাকে কাছে পেলে স্বর্গেব সুখও চাইতাম না,—সেই স্ত্রী আমার, ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে পা-দুটো জড়িয়ে ধবে' ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু ক্ষমা আমি তাকে কবতে পাবিনি, মুখখানা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে-ধরে' বুকে পা দিয়ে গলায় ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়েছি। ধারালো ইস্পাতের ছুরি! রক্তে—হ্যাঁ, লাল টকটকে তাজা রক্তে এই দুটো হাত আমার রাঙা হয়ে' উঠেছে, তবু আমি এতটুকু কাঁপিনি—বুঝলে শশিশেখর, আর এ ত' এই ক'টা জ্যান্ত মাছ!'

বলিয়া ঠক্‌ কবিয়া বাল্‌তিটা তাহার হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া শঙ্কর চলিয়া যাইতেছিল, শশিশেখর উন্মাদের মত হাতখানা তাহার চাপিয়া ধরিল। 'কি জন্যে মেরেছিলে শঙ্কর? কি অপরাধ—?'

'অপরাধ?'—শঙ্কর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিব,—'খবরের কাগজে পড়নি? ও, না, তুমি ত' তখন এইখানে। তার তিন দিন আগে আমি আমাব বাবাকে খুন করেছি। আমারই জন্মদাতা পিতাকে। সে খুনটা অবশ্য ধরা পড়েনি।'

এই বলিয়া চৌবাচ্চার ভিতরে মরা মাছগুলার দিকে কিয়ৎক্ষণ

একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া শঙ্কর মুখ তুলিয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'এবার বুঝেছ ত' কি অপরাধ ?'

মানুষের অপরাধ যে এখানে আসিয়াও পৌঁছিতে পারে সে ধারণা শশিশেখরের ছিল না। মুখের চেহারা তাহার অন্য রকম হইয়া গেল। বলিল—'থাক্ আর বলতে হবে না শঙ্কর !'

শঙ্করের চোখের সুমুখে তখন যেন আবার সেই বীভৎসতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে ! হাত দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, টিনের বাল্‌তিটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া, শঙ্কর যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল— 'অপরাধ ! অপরাধ ! মানুষের চেয়ে বড় অপরাধ আর কে করতে পারে, শশিশেখর ? যাদের আমি আমার নিজের সন্তান ব'লে জান্‌তাম, তা'রা আমার ভাই, আর সেই—আর সেই—আমার স্ত্রী ব'লে যে আমায় দিনের পর দিন—'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না, চোখদুইটা তখন তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বাল্‌তিটা সেখান হইতে জোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—'মানুষ দেবতা হ'তে পারে, সে কথা আমি আজ আর বিশ্বাস করি না, শশিশেখর—আমিও লেখাপড়া শিখেছিলাম, লোকে আমায় একদিন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ব'লে শ্রদ্ধা সম্মান কর্‌তো।'

এমন সময়ে পিছন দিক্ হইতে একজন ওয়ার্ডার্ আসিয়া শশিশেখরের পিঠে রুলের এক গুঁতা মারিয়া বলিল,—'ইউ শুয়ার্—'

কিন্তু কথাটা শঙ্কর তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যত মুষ্টি সিপাহীর গালের উপর সজোরে বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—'আর তোম্ শালা শুয়ারকা বাচ্চা !'

১২

সাতবৎসর শশিশেখরকে জেলখানায় থাকিতে হয় নাই। ছুটি ছাঁটা বাদ দিয়া হিসাব করিয়া সে দেখিল, জেল বাস করিয়াছে মাত্র ছয় বৎসর কয়েক মাস।

ছুটির দিন শশিশেখরের সঙ্গে আরও কয়েকজন কয়েদী খালাস পাইল। সকলের জন্যই আত্মীয়স্বজন জেলের দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, শুধু শশিশেখরের জন্যই কেহ আসে নাই। সকলের পশ্চাতে বিষণ্ণ মুখে সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শশিশেখরের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেখিলে আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। মুখে তাহার লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ, মাথায় বড় বড় চুল। সৌম্য শান্ত সন্ন্যাসীর মত চেহারা। দেখিলে ভক্তি হয়।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে?

ভাল হোক্ মন্দ হোক, এতদিন একটা আশ্রয় তাহার ছিল, এখন এই বিপুলা পৃথ্বীর কোথায় তাহার স্থান তাহা সে নিজেও জানে না। স্থান অবশ্য তাহার কোথাও কোনদিনই ছিল না, নিজেই সে তাহা বারে-বারে সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এতদিনে এটুকুও সে স্থির বুঝিয়াছে যে, মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হইবার জো নাই, কোন এক অদৃশ্য শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতিনিয়তই তাহাকে পরিচালনা করিতেছে, সেই শক্তিই মানুষকে তাহার যেখানে খুসী টানিয়া লইয়া চলে, যাহা খুসী তাহাই করায়,—হাসায়। কাঁদায়, দু'হাত ভরিয়া দেয়। একদিন অতুল ঐশ্বর্য্য দান করে, আবার একদিন সব কিছু কাড়িয়া লইয়া দীনহীন পথের ভিক্ষুক করিয়া দিয়া পথপ্রান্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কোথায় যাইবে, কি করিবে, ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাতীরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শশিশেখর চুপ করিয়া বসিল। অদূরে শান-বাঁধানো ঘাটে স্নানার্থিনী মহিলাদের যাওয়া আসা সুরু হইয়াছে। বৈশাখের প্রথম। খর রৌদ্রে ইহারই মধ্যে চারিদিকে যেন পুড়িয়া যাইতেছে। প্রচুর হট-বোঝাই-করা একটা গাড়ীর দুইটা বলদকে আরও একটু দ্রুত চলিবার ইঙ্গিত করিয়া হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানটা তাহার হাতের চামড়ার চাবুক দিয়া মারিয়া মারিয়া একেবারে হায়রাণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাদিকের গরুটা যেন আর পারিতেছে না—মুখে তাহার সাদা সাদা ফেনা ভাঙ্গিতেছে।

জামাজুতা শশিশেখর খুলিয়া ফেলিয়াছিল। সাত বৎসর আগে জেলের কর্তৃপক্ষ যে জামাজুতা তাহার গচ্ছিত রাখিয়াছিল, জেল হইতে বাহির হইবার সময়ে তাহাই তাহারা ফেরত দিয়াছে। সে-সব পরিবার ইচ্ছা তাহার আর নাই। দরিদ্র একজন ভিক্ষুক পার হইতেছিল। শশিশেখর হাতের ইসারায় তাহাকে কাছে ডাকিয়া একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রটি ছাড়া সব-কিছু তাহাকে দান করিয়া দিল! অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ভিক্ষুক চলিয়া গেল।

কিন্তু বিধাতার পরিহাস কি না কে জানে, ঠিক তাহার পর মুহূর্ত্তেই তাহারই সুমুখ দিয়া পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ যে-পথটি আঁকিয়া-বাকিয়া সহরতলীর বেশ্যাপল্লীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে দুইজন মহিলা পার হইতেছিল; পুরোবর্ত্তিনী সর্ব্বপ্রথমে শশি শেখরের মুখের পানে তাকাইয়া কি যে ভাবিল কে জানে, হঠাৎ তাহার কাপড়ের খুঁট হইতে গেরো খুলিয়া একটি পয়সা সে তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একটি প্রণাম করিল এবং তাহার দেখাদেখি পশ্চাতের মহিলাটি আরও একটুখানি আগাইয়া গিয়া

শশিশেখরের পায়ের কাছে গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া আসিবার সময়ে একটি দু'খানি নামাইয়া দিয়া উঠিয়া আসিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, শশিশেখর মৃদু একটুখানি হাসিল। অদূরে কনটে ইটের উনানে কাহারা বোধ করি কবে রান্না করিয়া খাইয়া গেছে। উনানের ভিতর একটুখানি আধপোড়া কাঠ ও প্রচুর ঘুঁটের ছাই তখনও পড়িয়াছিল। 'জয় ভগবান!' বলিয়া হাত বাড়াইয়া শশিশেখর সেই পরিত্যক্ত উনান হইতে কয়েক থাবা ছাই লইয়া বেশ করিয়া গায়ে মুখে মাখিয়া ফেলিল।

এবং সেই ছাইমাখা দেহ, লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ি আর উজ্জ্বল দুটি চক্ষুর কল্যাণে সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল, তাহার চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া জড়ো হইয়াছে, কে যেন একটা প্রকাণ্ড কাঠ আনিয়া কাছেই তাহার ধুনী জ্বালাইয়া দিয়াছে, আর সেই ধুনীর আগুনে আর কিছু না হোক্ হিন্দুস্থানী একজন গাড়োয়ানের তামাক খাওয়া চলিতেছে। শশিশেখরের সুমুখে কয়েকটি সিকি দু-আনি এবং অনেকগুলি পয়সা ছড়ানো, একটি শালপাতার উপর কয়েকটি কলা, কাগজের একটি মোড়কে বোধ করি খানিকটা গাঁজা ও একটি নূতন কলিকা নামান, পাশেই নূতন ভাঁড়ে খানিকটা জল। সকলেই বলাবলি করিতেছে—বাবা বোধ হয় মৌনী। অনেক চেষ্টা করিয়া, কেহ তাহাকে কথা বলাইতে পারে না, তবে সামান্য কিছু আহারের উপকরণ তাহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দয়া করিয়া যদি তিনি তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া আহার করেন—তবেই।

গঙ্গার ওপারে অনেকখানা জায়গা জুড়িয়া প্রকাণ্ড জেলখানা, এপারে সারি সারি সুরকিভাঙ্গা কল, বেশ্যাদের বস্তি, চুণ, বালি আর ইটের গুদাম। এই সব গুদামের কুলি-মজুর, আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরাই শশিশেখরের চারিদিকে জটলা করিয়া বসিয়াছে।

বৈকালের দিকে আরও কিছু খাবার আসিল। বুধ্নীয়ার বড় গাইটার বাছুর হইয়াছে। ঘরে তাহার দু'বেলায় চারসের করিয়া দুধ। বিনামূল্যে বিতরণ যদি করিতেই হয় ত' সাধু সন্ন্যাসীকেই দেওয়া উচিত, তাহা ছাড়া গঙ্গার ঘাটে বিচালি ভিজাইতে আসিয়া বাবাজীকে বুধ্নীয়া স্বচক্ষে একবার দেখিয়াও গিয়াছে। চোখ বুজিয়া কাহারও কাছে কিছু চা'ন না, ক'ন না,—এই ত' সন্ন্যাসী! চিম্‌টা বাজাইয়া দোরে দোরে যাহারা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, সে-সব সাধু সন্ন্যাসীদের দিয়া কিছু লাভ নাই—এম্‌নি সব নানান্ কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়ের আশায়, কাঁসার একটি ঘটিতে প্রায় সেরখানেক্ দুধ গরম করিয়া বুধ্নীয়া নিজের হাতেই ঘটিটি লইয়া বাবার কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।

হরখু বলিল,—'থাক্, তোমার লোটাসুদ্ধই দিয়ে যাও, আমি আবার পৌঁছে দিয়ে আসব।'

অমর মল্লিকের সুরকি-কলের কর্ম্মচারী অবিনাশের পায়ে একটা ঘা হইয়া কিছুতেই আর সারিতেছে না। এলোপ্যাথ ডাক্তারেরা বলেন, ইন্‌জেক্‌সন লইতে হইবে, তাহার খরচ অনেক—কাজেই সেটা ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিন হইতে সে হোমিওপ্যাথী ধরিয়াছিল। এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার করিয়া তাহাতেও কিছু টাকা গিয়াছে। এখন আর ও সব কোন ঔষধের উপর বিশ্বাস তাহার নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে সে সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈবের উপর এখন তাহার অচলা ভক্তি। ঘন্টাখানেক ধরিয়া সেও এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ঘায়ের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মনে-মনে সে ইহাই স্থির করিল, সন্ধ্যার পর বাবা যখন তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করিবেন, সেই সময়ে কিছু ফলমূল লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

তাই অবিনাশও এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাজার হইতে কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

শশিশেখরও অনেকক্ষণ হইতেই সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতেছিল।

সূর্য্যাস্তের পর হইতে সেই যে সে চোখ বুজিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া অস্ফুটভাবে বিড় বিড় শব্দ করিতেছে, একটিবারের জন্যও চোখ মেলিয়া চাহে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা নামিল। নদীর ও-পারের পায়ে-চলা সরু পথটি প্রথমে অদৃশ্য হইল, তাহার পর গাছপালা ঘর বাড়ী সব-কিছুই অস্পষ্ট হইয়া আসিল, এপারে রাস্তার উপর আলো জ্বলিল এবং সেই রাস্তার আলোকের সঙ্গে জ্যোৎস্না মিশিয়া অশ্বত্থগাছের তলায় শশিশেখরের এই আস্তানাটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল।

অবিনাশ একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইয়া আসিল। হরখু আর একটা আনিল।

কিন্তু চোখ মেলিয়াই শশিশেখর, যে-সব কাণ্ড করিতে সুরু করিল, সমাগত ভক্তমণ্ডলীর পক্ষে তাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত! তাহারা ভাবিয়াছিল, সন্ধ্যার পর, প্রচুর আহার্য্য প্রস্তুত দেখিয়া বাবাজী খুসী নিশ্চয়ই হইবেন, চাই-কি যাহারা স্বেচ্ছায় সেগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাদের উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িতেও পারে। কিন্তু শশিশেখর সে পথ দিয়াও গেল না। রাগ করিয়া অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—'তোরা কি জন্যে বসে' আছিস এখানে? দূর হ! দূর হ! আর এ সব কেন?' বলিয়া হাত দিয়া এটা সেটা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া দিয়া ঘটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

অবিনাশ একবার বুধ্‌নীয়ার কাছে দুধের রোজ লইতে গিয়া ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে। মাগী টাকায় তিন সেরের বেশী দুধ কিছুতেই দিতে চায় না, অথচ বাজারে আজকাল টাকায় চারসের দুধ। কাজেই বুধ্‌নীয়ার

উপর রাগ তাহার একটু ছিলই। দুধের ঘটিটা শশিশেখর ফেলিয়া দিতেই অবিনাশ বলিয়া উঠিল—'দুধে জল ছিল ঠিক। তা নইলে……'

হরখু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'না না' তাকি দিতে পারে কখনও? আচ্ছা, আমি শুধিয়ে আসি দাঁড়াও!'

বলিয়া ঘটিয়া লইয়া হরখু বুধনীয়াব কাছে চলিয়া গেল।

কাজেই ঘব, ফিবিয়া আসিতে দেরী হইল না। কিন্তু ফিরিল সে আবাব একবটি খাঁটি দুধ লইয়া। আসিয়া বলিল—'হ্যাঁ ঠিক, অবিনাশেব কথাই সত্যি। জল এতটুকু মাগী দিয়েছিল। আচ্ছা ধবা পড়ে' গেছে কিন্তু।'

বাবা যে অন্তর্য্যামী, সে কথা বুঝিতে আব কাহারও বিলম্ব হইল না।

অবিনাশ অনেকক্ষণ হইতেই তাহাব নিজেব আনা ফলগুলি লইয়া বাবাজীকে খাইবাব জন্য অনুবোধ করিতেছিল।

অবশেষে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে শশিশেখর কহিল,—'আচ্ছা রাখ্। কিন্তু হাঁরে, তোবা আমায় খেতে বল্‌ছিস—আমাব ভগবান খেয়েছে?'

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সকলে হাঁ করিয়া তাহার মুখের পানে হাতজোড করিয়া তাকাইয়া রহিল।

শশিশেখর বলিল 'আচ্ছা, ডাক্ দেখি—ছোট একটি ছেলেকে ডাক্ দেখি তোরা! শীগ্‌গিব ডেকে আন্।'

অবিনাশ ছুটিতে ছুটিতে নিজেই গেল এবং অবিলম্বে পথ হইতে একটি ছেলেকে ধরিয়া আনিল।

শশিশেখর তাহার দুহাতে দুইটি কলা ছাড়াইয়া দিয়া বলিল—'খাও বাবা, খাও, আমার কাছে বসে' বসে' খাও।'

এমন অসময়ে হাতে কলা পাইয়া ছেলেটি সানন্দে তাহা খাইয়া ফেলিল। তাহার পর আরও দুইটি কলা, তাহার পর একটুখানি দুধ।

ছেলেটির খাওয়া শেষ হইলে, শশিশেখরও ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—'যাও।'

তাহার পর মাটিতে এক অঞ্জলি জল লইয়া শশিশেখর বিড়্ বিড়্ করিয়া চোখ বুজিয়া মন্ত্রেব মত কি যেন বলিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পবে সেই জল সমাগত ভক্তমণ্ডলীব গায়েব উপব ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিল—'ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!'

একটুখানি জলেব ছিটা পাইবাব আশায় অবিনাশ তাড়াতাড়ি তাহার বাঁ পায়েব কাপড়খানা হাঁটু অবধি তুলিয়া দগ্‌দগে ঘা'টা তাহার অনাবৃত করিয়া ধবিল। বলিল—'এই বাবা, এবই জন্য যা-কিছু! এবই একটুখানি ওষুধেব জন্যে—'

হাতেব ইসাবায় শশিশেখব বলিল, 'থাম্।'

বলিয়া চোখ বুজিযা কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'গত জন্মে তোর স্ত্রীর গায়ে ওই পা দিয়ে লাথি মেরেছিলি। সেই পাপের ভোগ চলছে।'

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বসিয়াই তাহার আরও একটুখানি কাছে আগাইয়া গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, 'তাহ'লে কি হবে বাবা? ভোগ কি আমার এখনও আছে?'

শশিশেখর বলিল, 'আছে। কিন্তু সে ভোগ আমি তোর শেষ করে' দিচ্ছি। কাল সকালে একবার দেখা করিস্।' "শিব শম্ভু! শিব শম্ভু!" বলিয়া আবাব সে চোখ বুজিল।

সকলেই তখন নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে এ-উহার মুখ-চাওয়া চাওয়ি করিতে সুরু করিয়াছে এবং অবিনাশের অবস্থা একেবারে সাংঘাতিক! ভক্তির আতিশয্যে এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া তখন সে তাহাব পা দুইটাকে পিছনের দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়া মাটির উপরেই সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

শশিশেখর বলিল, 'আমার কাছে অমন ক'রে পড়লি কেন বাবা, আমি কে?—ওই ওপরের দিকে তাকা। বিধাতাকে একবার ক'রে দিনান্তেও স্মরণ করিস্।' বলিয়া সে উপরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল।

দু'একজন সত্য সত্যই হাঁ করিয়া মাথার উপব অশ্বত্থ গাছের ডাল-পালাগুলার দিকে তাকাইল, বাকি সকলে হাতজোড় করিয়া একসঙ্গে প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, 'না বাবা, তুমিই আমাদের ভগবান, তুমিই সব।'

শশিশেখব আবার রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'দূব হ, তোবা সব দূব হয়ে যা এখান থেকে। কি জন্যে এসেছিস? আমার কাছে তোদেব কি দরকার?—যা যা সব দূর হ'য়ে যা।'

কিন্তু সে কথায় তাহারা কেহই উঠিল না।

হরখুব অবস্থা হইল ঠিক অবিনাশেব মত। অবিনাশ যদিই বা চুপ করিয়াছিল, হরখু শুইয়া শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে শশিশেখব কহিল, 'যা তোরা, ওই ধুনির কাছে একটু বোস্। পিছন ফিবে বসিস্। এদিক্ পানে কেউ তাকাস্ নে।'

এবার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলেই উঠিয়া গেল এবং সেই অবসরে শশিশেখব পিছন ফিরিয়া আহারে বসিল।

১৩

গঙ্গাতীরের সেই বৃক্ষতলে শশিশেখর দু'তিন দিনের বেশি ছিল না।

একবৎসর পরে শশিশেখরকে আমরা আবার দেখিলাম। দেখিলাম পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ধামে। সহর হইতে একটুখানি দূরে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা। সুমুখে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ফুলের বাগান এবং উপাসনা-মন্দির। তাহার পরেই অট্টালিকার প্রবেশদ্বার। বামদিকে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে বিরাট্ পাকশালা এবং ভোজনকক্ষ। এখানে নাকি অতিথি আসিলে কেহ কোনো দিন ফিরিয়া যায় না। যে যখন আসে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তখনই সে খাইতে পায়। দক্ষিণ দিকে চওড়া একটি সিঁড়ির নীচে মোটা মোটা অক্ষরে একটি কাগজের গায়ে লেখা—'দয়া করিয়া জুতা খুলিয়া খালি পায়ে ঠাকুরের নিকট যাইবেন।'

সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত কেহই হয় না। দিবসরাত্রির প্রায় সকল সময়েই দেখা যায়—অসংখ্য জুতা সেইখানে পড়িয়া আছে। সিঁড়ির উপরের 'হল্' পার হইয়া প্রথমেই যেন সুবিস্তৃত ঘরখানির দরজা-জানালায় খসের পর্দা টাঙ্গানো, সেইখানিই ঠাকুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। দরজায় খাতা কলম লইয়া সন্ন্যাসীগোছের একজন লোক সর্ব্বদাই বসিয়া থাকে। ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষী কেহ সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেই প্রশ্ন হয়, 'মশাইএর নাম?' 'ঠিকানা?' ঠাকুরের শিষ্য?'

যথাযথ জবাবগুলি খাতায় লিখিয়া রাখিবার পর সে যাইবার হুকুম দেয়। সুগন্ধি খসের পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেই দেখা যায়—মেঝের উপর আগাগোড়া দামী কার্পেট পাতা, তাহারই উপর চক্রাকারে আগন্তুকেরা নিজেদের পা ঢাকিয়া বসিয়া আছেন এবং সেই চক্রবৃত্তের মধ্যস্থলে পুরু জাজিমের উপর তুলার নরম গদি, গদির চতুর্দ্দিকে রঙিন

রেশমের ওয়াড়-দেওয়া বালিস, আর তাহারই ঠিক মাঝখানে সর্ব্বাঙ্গে গেরুয়ারঙের সিল্ক-পরিহিত শ্রীমৎ ঠাকুর উমানন্দ স্বামী।

ইনিই আমাদের শশিশেখর।

একবৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরের সেই অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় যে জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ হয়ত' এমনি করিয়াই তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে! এত দ্রুত যে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, শশিশেখরকে যাহারা চেনে না তাহারা অবশ্য বিশ্বাস করে নাই। শশিশেখর নিজেও যে ঠিক এই রকমটি হইবে ভাবিয়াছিল তাহা নয়, তাহার ছিল মাত্র অসাধারণ বুদ্ধি এবং বাকি যাহাকিছু, সবই করিয়াছে তাহার শিষ্যবর্গ। তাহারাই তাহাদের মাথা নোয়াইবার ব্যাকুল আগ্রহ এবং অচলা ভক্তি দিয়া তাহাকে আজ ভগবান গড়িয়া তুলিয়াছে। একজন তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেই আবার দশজনকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার কাছে দীক্ষা লইবার জন্য দলে দলে নরনারী আসিয়া তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। শশিশেখর একটি কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছে কি তৎক্ষণাৎ তাহার কত রকমের কত ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং অল্প কয়েকদিন মধ্যেই তাহার সম্বন্ধে যে সব অত্যদ্ভুত কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহা শুনিয়া এক একদিন সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গিয়া শুধু মনে মনে একটুখানি হাসিয়াছে মাত্র। আশ্রম এবং অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র শিষ্যেরা চাঁদা তুলিয়া এই বিরাট ব্যাপার গড়িয়া তুলিয়াছে। হাজার হাজার প্রণামীর টাকা আসিয়া জুটিয়াছে, শশিশেখর তাহা হাত দিয়া স্পর্শও করে নাই; শিষ্যদের মধ্যে কেহ হয়ত দয়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটি সহি করাইয়া লইয়া টাকাগুলি ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং চেক্ বইখানি তাহার বালিসের তলায়

রাখিয়া দিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়াছে, যে ঠাকুরের কি আর এসব দিকে মন দেবার অবসর আছে? যাবে হয়ত ওটা কোন্‌দিকে হারিয়ে।

ঠাকুর শুনিয়া হয়ত' নিতান্ত অন্যমনস্কের মত ঈষৎ হাসিয়াছেন। হাসিয়া বলিয়াছেন, 'না রে, তোরা আমায় যত বোকা ভাবিস অত বোকা আমি নই। আরও টাকা জমুক, তারপর ওই দিয়ে কি করব দেখে নিস্।'

কি করিবেন তাহাই জানিবার জন্য কৌতূহলী শিষ্যের দল তাঁহার মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর চোখ বুজিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিয়াছেন, 'পাঁচ লক্ষ টাকা মা আমায় এম্‌নি করে' পাইয়ে দেবেন বলেছেন। পাঁচ লক্ষের কম হবে না। সেই টাকা দিয়ে এই কাশীধামে একটি, আর কলকাতায় একটি—দুটি মন্দির তৈরী হবার পর দেখবি—ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রগুলি আপনাথেকেই ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। এই দুটি মন্দির ছাড়া কেউ আর কোনও তীর্থক্ষেত্রে যাবে না। শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর নানা দিক্ দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নরনারী প্রত্যহ সেখানে এসে জুটবে; সে মন্দিরের মজাই হবে এই যে, যত বড় শোকার্ত্ত আর যত বড় দুঃখীই হোক্, মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াবামাত্র তার সে দুঃখ শোক সে ভুলে যাবে। ভগবানকে দেখা যায় না বলে' মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা, সে ধারণা তার আর থাকবে না। ভক্তি আর বিশ্বাস যার থাকবে, প্রতি অমাবস্যার রাত্রে ভগবান তাকে এই মন্দিরের মধ্যে মাতৃরূপে এসে দেখা দিবেন, কথা কইবেন, সুখদুঃখের কথা শুনাবেন; পৃথিবীর মানুষ তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হবে। আমার ওপর এই তাঁর আদেশ।'

তাহার পর তিনি আরও বলিয়াছেন, 'তোমাদেরই অর্থে তৈরি হবে

এ মন্দিব, কাজেই তোমবাই হবে মা'ব প্রধান সন্তান। তোমাদেব যেদিন খুসী শুদ্ধ সংযত হয়ে তিনবার মাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই মা'ব দেখা পাবে।'

এই কথা শুনিয়া সেদিন শিষ্য দুর্গাশঙ্কব বলিয়াছেন, 'আচ্ছা, আমবা যদি ওই পাঁচলাখ টাকা তোল্‌বাব চেষ্টা কবি? মন্দির দুটি তাহ'লে তাডাতাড়ি—'

ঠাকুর সে কথা তাহাকে শেষ কবিতে দেন নাই। ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, 'না। ভগবানেব আদেশ—আমাব ওই প্রণামীব টাকা জমে' জমেই মন্দিব হবে, তোবা ভাবিসনে। তবে হ্যাঁ, তার আগেই যদি আমাব অন্য কোথাও প্রয়োজন হয় ত' দেহবক্ষা করতে পাবি, কিম্বা হঠাৎ একদিন আমাব এই নশ্বব দেহ লোকচক্ষুর অগোচবে অন্তর্হিত হ'তেও পারে। তাই বলে' ভাবিস নে যে মন্দির অসমাপ্ত রয়ে যাবে। তোদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যাব, তোবাই কাজ আরম্ভ করিস, আমার আত্মা অলক্ষ্যে থেকে তোদেব সাহায্য করবে।'

এই বলিয়া হঠাৎ তিনি সমাধিস্থ হইলেন।

এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধি তাঁহার প্রায়ই হয়, খোল করতালি বাজাইয়া কিছুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলেই আবার তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পান। এবার কিন্তু তাঁহার সে সমাধি ভঙ্গ করিতে সকলকেই বেশ বেগ পাইতে হইল।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে তাঁহার চৈতন্য হইতেই দেখা গেল, তাঁহার চোখে জল।

বলিলেন—'আমার শিষ্যদের মধ্যে কার যেন একটা বিপদ ঘটল দেখলাম। কিন্তু তখন আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছি, মুখখানা ভাল চিনতে পারলাম না, মনে হলো যেন জিতেনের মুখ।'

তিন দিন পরে বর্দ্ধমান জেলার কোন একটি গ্রাম হইতে ঠাকুরের নামে একখানি পত্র আসিল। ঠাকুরের পদবন্দনা করিয়া তাঁহার শিষ্য জিতেন লিখিয়াছে, তাহাব মধ্যম পুত্রটি শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিরদিনেব জন্য আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে।

বলা বাহুল্য, তাহার এই পুত্রটিব আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ জিতেন তাহার পূর্ব্বেই ঠাকুরকে জানাইয়াছিল।

চিঠিখানি যে সেদিন তিনি ইচ্ছা কবিয়াই সকলকে দেখাইলেন তাহা নয়, তাঁহাব আসনেব নীচে এমনভাবে পড়িয়াছিল যে, যে আসিল সে-ই একবাব করিয়া চিঠিখানি উল্‌টাইয়া দেখিল এবং ঠাকুরেব সর্ব্বদর্শিতা সম্বন্ধে কাহারও আব কোনও সংশয় রহিল না।

শশিশেখব যে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আহ্নিকেব সময়ে এবং সমাধিস্থ অবস্থায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন কবেন, সে-কথা সকলেই জানে এবং ইহাও জানে যে, শক্তিতে সামর্থ্যে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান অপেক্ষা কোনও অংশেই তিনি ছোট ন'ন। তাই দেখা যায়, প্রায় প্রতি শনিবার অতি প্রত্যুষে ঠাকুর যখন নানাবিধ লতাপুষ্পে সুসজ্জিত মোটরে চড়িয়া গঙ্গাস্নান কবিতে আসেন, ভক্তেব দল তখন কেহ-বা তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকে, কেহ-বা পা-দানির উপর দাঁড়াইয়া একহাতে শাঁক বাজায়, কেহ-বা চীৎকাব করিয়া ঘোষণা কবে—'জয় বাবা উমানন্দ স্বামীকি জয়' আবার কাহারও বা ভক্তির আতিশয্যে কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, ধারা-বিগলিত চক্ষে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঠাকুরেব মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে আর তাহাদেরই মাঝখানে গৈরিক বঙের সিল্কেব ধুতি পরিধান করিয়া গৌরাঙ্গ ঠাকুর শশিশেখর আপন-ভোলা তন্ময়ভাবে চুপ কবিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া কখনও-বা চোখের তারা উল্টাইয়া বসিয়া

থাকেন, গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মালা দোলে, মাথায় বড় বড় চুল ও দাড়ি বাতাসে উড়িতে থাকে, তার উগ্রগন্ধি অগুরু ও চন্দন-চর্চ্চিত দেহ হইতে ভুর্ ভুর্ করিয়া সুগন্ধ বাহির হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া উঠিবামাত্র অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত তোয়ালে দিয়া কেহ বা তাঁহার মাথা মুছাইয়া দেয়, কেহ-বা গা মুছায়, আবার শিষ্যা যদি কেহ কোনদিন সঙ্গে থাকেন ত' তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আলুলায়িত কেশের গুচ্ছ দিয়া ঠাকুরের পায়ের জলটুকু মুছাইয়া লইয়া জীবন সার্থক করেন। কাপড়ের কাণ্ডারী দিয়া ঘিরিয়া সেইখানেই তাঁহাকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করানো হয় এবং পুনরায় তাঁহাকে নূতন ফুলের মালা পরাইয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ছিটাইয়া, মাথায় ছাতা ধরিয়া বলিয়া দেওয়া হয়—'এবার তা'হলে···

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না। ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করিয়া তিনি হাঁটিতে সুরু করেন। ঘাট হইতে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির পর্য্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যান; কিন্তু মন্দিরে গিয়া কোনোদিন তিনি মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করেন না, হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া চোখ বুঝিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারিদিকে লোক জড়ো হইয়া যায়। লোকের ভীড় সরাইয়া পুনরায় তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিতে হয়।

এমনি করিয়া শশিশেখরের দিন বেশ ভালই কাটিতেছে। এমন দিনে সেদিন সন্ধ্যায় একখানি টাঙ্গায় চড়িয়া একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া একটি মহিলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং হাঁটু গাড়িয়া একটি প্রণাম করিয়া সসঙ্কোচে একপাশে চুপ করিয়া বসিল। সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিল সেও অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহারই পাশে বসিয়া ঠাকুরের শূন্য আসনের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন তাঁহাব আহ্নিকেব ঘরে পূজায় বসিয়াছেন।

ঘরে মাত্র কয়েকজন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। এইবার একে-একে অনেকেই আসিবেন। তাঁহাদেবই মধ্য হইতে নিশানাথ উঠিয়া মহিলাটিব সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে একটি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মশাইএব নাম?'

লোকটি সাধাবণ মানুষ অপেক্ষা বোধহয় একটু বেশি লম্বা, এবং সেই অনুপাতে রোগা, রং ফবসা, চোখ দুইটি অত্যন্ত বড়। নাম বলিবার ইচ্ছা বোধহয় তাহাব ছিল না, কিম্বা হয়ত এইমাত্র দবজায় একবাব নাম বলিয়া আসিয়া আবার আর-একবাব নাম জিজ্ঞাসা করায় মনে-মনে চটিয়া উঠিল। অতিকষ্টে তাহাব সে বিরক্তিব ভাব দমন করিয়া বলিল, 'বিভুতিভূষণ মিত্র।'

'কি জন্যে আসা হয়েছে মশাইএব?

বিভুতিভূষণ এইবার বোধহয় সত্যই চটিল। মহিলাটির দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'বল গো বল।—আমি জানি না মশাই, ওই ওকে জিজ্ঞেস করুন। আজ সাত-আটদিন ধ'বে মশাই হায়রানীব একশেষ! ওঁব আর গুরু পছন্দ হয় না। একগ্লাস জল দিতে পারেন?'

নিশানাথ তৎক্ষণাৎ কাঁচের একটি গেলাসে একগ্লাস জল আনিয়া তাহার হাতে দিল। ঢক্ ঢক্ করিয়া সমস্ত জলটুকু খাইয়া ফেলিয়া গেলাসটি নামাইতে গিয়া বলিল, 'ও, এখানে বুঝি আবার এঁটো গেলাস দিন মশাই একটু জল দিন—ধুয়েই দিই।'

নিশানাথ বলিল, 'না, ধুতে হবে না, গ্লাস আপনি নামিয়ে রাখুন। বদ্রি!'

হিন্দুস্থানী একজন চাকর তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকিয়া গ্লাসটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া গেল।

'পান খাবেন ?'

বিভূতিভূষণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'ওঃ ! বাঁচান্ মশাই তাহ'লে।'

নিশানাথ পান আনিবার হুকুম দিল।

বিভূতিভূষণ বলিতে লাগিল, 'ক'দিন মশাই সময়ে না আছে খাওয়া না আছে স্নান, গুরু গুরু ক'রে মেয়েটি পাগল ! আজ অমুক স্বামীজি, কাল অমুক্ পরমহংস, অমুক্ সাধু, অমুক্ সন্ন্যাসী, তা'পর মশাই এই এঁকে কোথায় কোন্ মন্দিরে না গঙ্গার ঘাটে দেখেছে, ঠিকানা যোগাড় করেছে, আরও কত কি সব শুনেছে, শুনে অবধি বলে—চল ওইখানে চল—আর কোথাও নয়। বাস্, আমার কাজ শেষ —কি ? পান ? দাও বাবা দাও।'

বলিয়া বদ্রীর হাত হইতে পান দুইটি লইয়া মুখে পুরিয়া বলিল, 'এইবার দিন—আপনাদের গুরুঠাকুরের সঙ্গে ওর একবার দেখা করিয়ে দিন, দেনা-পাওনার কথাবার্ত্তা সব চুকে যাক, তারপর ভাল একটি দিন-টিন দেখে—'

এমন সময়ে আহ্নিকের ঘর হইতে টুং করিয়া একটি ঘণ্টা বাজিল।

ঠাকুরের ডাকিবার সঙ্কেত !

কিন্তু প্রধান কয়েকজন শিষ্য ছাড়া সেখানে আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই।

নিশানাথ বলিল, 'আস্‌ছি।'

আহ্নিকের ঘরের এদিককার দেওয়ালের গায়ে কাপড়ের পর্দ্দা দিয়া ঢাকা ছোট একটি জানালার পথে এ-ঘরের প্রত্যেক বস্তুটিই দেখা যায়। জানালাটি সব সময়েই বন্ধ থাকে। ঠাকুর ছাড়া এ-জানালা খুলিবার হুকুম কাহারও নাই। সেদিন বোধকরি এই জানালার ফাঁকেই নবাগত

এই অতিথি দুইজনকে দেখিয়া নিশানাথকে ঠাকুর ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকিলেন।

ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিশানাথ হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল।

পদ্মাসনে অর্দ্ধনিমীলিত-চক্ষে ঠাকুর বসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'এসো।'

আদেশের অপেক্ষায় নিশানাথ হাতজোড় করিয়া বসিল।

ঠাকুর বলিলেন, 'ওই যে মহিলাটি এসেছেন, বোধকরি দীক্ষা নেবার জন্যে। ওঁকে বলে দাও—দীক্ষা নেবার সময় তাঁর এখনও হয়নি। জীবনে বহু পাপ উনি করেছেন, আর এই এতদিন পরে তাঁর অনুতাপ সুরু হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তি করে' জীবন কাটিয়েছেন—উনি বেশ্যা।'

নিশানাথ চটিয়া উঠিল।—'বেশ্যা! আর ও এসেছে কিনা আপনার কাছে—'

হাত তুলিয়া ঠাকুর তাহাকে শান্ত হইতে বলিলেন।—'উত্তেজিত হোয়ো না নিশানাথ, ছি! বেশ্যা হলেও মানুষ ত'! উনি যদি একান্তই না ছাড়েন ত' ওঁকে মন্ত্র দীক্ষা আমি দেবো। জিজ্ঞাসা কোরো, উনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব আমার এই অন্নসত্রে দান করে' দীনদুঃখী অনাথ-আতুরের সেবার ভার গ্রহণ করতে পারবেন কিনা। তা' যদি না পারেন ত' ওঁকে যেতে বলে দাও।'

নিশানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুর আবার বলিলেন, 'ওঁর অসম্মান কোরো না। রাজী যদি হ'ন ত' এইখানে নিয়ে এসো।'

'এইখানে? এই পূজার ঘরে?'

ঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন।

নিশানাথ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া।

আহ্নিকের ঘরে তখন নীলরঙের মৃদু একটি আলো জ্বলিতেছে, পুষ্প চন্দন ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত, আর ঠাকুর তখনও তেমনি পূজার আসনে ধ্যানস্তিমিত চক্ষে খাড়া বসিয়া আছেন।

গলায় আঁচল জড়াইয়া মহিলাটি সসম্ভ্রমে একটি প্রণাম করিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে একটি গিনি নামাইয়া দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমায় মন্ত্র দিন বাবা, দয়া করে,' এ পাপীকে উদ্ধার করুন।'

কিন্তু সে কথার কোনও জবাব না দিয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে ঠাকুর ডাকিলেন, 'নিশানাথ!'

নিশানাথ জোড়হস্তে পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'বলুন!'

'বলেছ?'

নিশানাথ ঘাড় নাড়িয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, মেয়েটির কথায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সে একেবারে উন্মাদিনীর মত ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সেইখানেই গড়াগড়ি দিয়া পড়িল,—'আমার যথা-সর্ব্বস্ব দিয়েই আমি মন্ত্র নিতে চাই ঠাকুর, অনেক পাপ করেছি জীবনে—আর না।'

নিশানাথ বলিল, 'এই অন্নবস্ত্রের সেবার ভার তোমায় নিতে হবে। পারবে?'

'পারব। একবেলা চারটি খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছু আমি চাইনে। আমার নিজের বলতে যা-কিছু ছিল কলকাতায় সবই বিক্রি করে' দিয়ে কাশী এসেছি, এইখানেই আমি মরতে চাই।'

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি তোমার আছে?'

'যৎসামান্যই। একলাখ পঁচিশ হাজার টাকা নগদ, আর আমার গয়না-গাঁটি দু'চারটে।'

নিশানাথ চমকিয়া উঠিল, কিন্তু ঠাকুর নির্ব্বিকার!

ঠাকুরকে চুপ করিয়া আবার ধ্যানমগ্ন হইতে দেখিয়া মেয়েটি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল! আবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তাহ'লে কি হবে বাবা? আমার কি কোনও উপায়ই হবে না?'

ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন।

মেয়েটির কান্না কিছুতেই থামিল না! শেষে গড়াগড়ি দিয়া সেই-খানেই শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া ঠাকুরের পাদুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'এসেছি যখন, তখন আর ছাড়ব না।'

ঠাকুর বলিলেন, 'কাঁদো' ওই ভগবানের কাছে কাঁদো। আমার কাছে নয়!'

বলিয়া পাদুইটা তিনি সরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'অর্থের মোহ যতদিন আছে পরমার্থ লাভ ততদিন হবে না।'

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'অর্থ বল্‌তে আমার যা-কিছু আছে, সবই আমি ওই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ঢেলে দেবো বাবা, নিজের বল্‌তে কিছুই আর রাখব না। যে-পাপ এ জীবনে করলাম, পরজন্মে আর যেন আমাকে এ-পাপ করতে না হয়!'

ঠাকুর আবার তেমনি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সোজা হইয়া বসিলেন, এক অঞ্জলি ফুল লইয়া মুষ্টিবদ্ধ হাতদুইটি তিনি তাঁহার বুকের কাছে তুলিয়া রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'আমার পূজার মন্দিরে তুমিই প্রথম বারবণিতা, মনে তোমার অনুতাপের আগুন জ্বলেছে, এই আগুনেই তোমার আজন্মার্জ্জিত সমস্ত কলুষ পুড়ে' ছাই হ'য়ে যাবে। আমি তোমার পথপ্রদর্শক, তোমার দেবতা নই। ভগবান তোমার শান্তি বিধান করুন, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক!'

বলিতে বলিতে ঠাকুর ধীরে-ধীবে কাঁপিতে সুরু করিলেন। ইহাই তাঁহার সমাধির পূর্ব্বাবস্থা। নিশানাথ তাড়াতাড়ি তাঁহার পাশে গিয়া বসিল। মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'ভগবানের নাম স্মরণ কর, ঠাকুরের সমাধি হবে।'

হইলও তাই।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুব সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন। নিশানাথ তৎক্ষণাৎ ঘন্টা বাজাইয়া দিল। প্রধান শিষ্য তখন আসিয়াছে মাত্র পাঁচজন। পাঁচজনেই তাডাতাড়ি ঠাকুরের আহ্নিকের ঘরে গিয়া খোল করতাল বাজাইয়া ভজন গাহিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পবে ঠাকুব তেমনি শুইয়া শুইয়াই ডাকিলেন, 'এসো তুমি আমার কাছে সবে' এসো।'

কাহাকে ডাকিতেছেন, শিষ্যেবা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই।

নিশানাথ বলিল, 'বোধহয় ওই মেয়েটিকে ডাকছেন। এসো তুমি ঠাকুরের কাছে এসো। কি বলছেন শোনো।'

মেয়েটিব দুই চোখ দিয়া তখন দর্ দর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সঙ্কোচে সে ঠাকুবেব কাছে আসিয়া বসিল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এক পতিতার কন্যা। তা হোক্ তোমায় আমি মুক্তি দেব। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

মেয়েটি জোড়হস্তে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'বলুন!'

'একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুমি দারুণ মিথ্যাচাব করেছিলে, তার কথ তোমার মনে আছে?'

'করেছিলাম বাবা! সেইজন্যই আজ আমাব—'

মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল।

'তোমায় আমি অনেক দুঃখ দেবো। সহ্য করতে পারবে?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'পারব।'

'ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে?'

'আছে।'

'এ বিশ্বাস কতদিন থাকবে?'

'চিরকাল।'

'মববার দিন পর্য্যন্ত তোমায় এই আশ্রমে বাস কবতে হবে।'

'কবব।'

'পবিত্রভাবে জীবন যাপন কবতে হবে।'

'কবব।'

'প্রতিদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ কবে' সেই ব্রাহ্মণকে আগে স্মরণ করবে, মনে-মনে তাঁব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কববে, তাবপব ভগবানের নাম নেবে।'

'হ্যাঁ। আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে প্রস্তুত।'

'যে অর্থ তুমি ভগবানের নামে দান করবে তার কথা জীবনে আর তুমি ভুলেও ভাববে না।'

"'না।'

'প্রতিদিন প্রভাতে উঠে গঙ্গাস্নান করবে, তাবপর পূজা করবে, তারপর অন্নসত্রের সমস্ত ব্যবস্থা তোমায় নিজে দেখাশোনা করতে হবে, তারপর প্রতিদিন অন্ততঃ দশজন অনাথ আতুরকে অন্নদান না করে' তুমি জলগ্রহণ করবে না।'

'বেশ।'

'যে ব্রাহ্মণকে তুমি প্রতারণা করেছিলে, তিনি তোমার ওপর সরল বিশ্বাসে যথাসর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ করেছিলেন; ভালবেসেছিলেন, প্রতিদানে চেয়েছিলেন একটুখানি পবিত্র ভালবাসা, তুমি তাঁর সে

ভালবাসায় পদাঘাত করেছিলে। সে আঘাত ব্রাহ্মণের বুকে যত না বেজেছিল, তার চেয়ে বেশি বেজেছিল ভগবানের বুকে। কিন্তু গত জন্মে তুমি কিছু পুণ্য করেছিলে, আজ তারই জোরে তোমার এই আশাতীত সৌভাগ্য।—তুমি আজ যাও। কাল আর এসো না। পরশু সকালে গঙ্গাস্নান করে' একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসো। ধরো।'

বলিয়া তিনি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হাতে তখনও পর্য্যন্ত যে ফুলগুলি ধরিয়াছিলেন, তাহাই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন 'ভগবান তোমার কল্যাণ করুন!'

সামান্য এই মেয়েটার এত সৌভাগ্য!

শিষ্যেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কিন্তু ঠাকুর সেদিন কেমন যেন হইয়া গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর অন্যদিন যদিই-বা দু'চারটা কথা বলেন, সেদিন আর একটি কথাও মুখ দিয়া উচ্চারণ করিলেন না।

মেয়েটির মন্ত্রদীক্ষা লওয়া শেষ হইয়াছে।

এক' লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার কথাও মিথ্যা নয়। আপাততঃ অন্নসত্রের মজুত তহবিলে আরও পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া বাকী এক লক্ষ ঠাকুর নিজের নামে ব্যাঙ্কে রাখিয়াছেন।

ঠাকুর আজকাল সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। আহ্নিকের ঘরে ঢুকিয়া সহজে আর বাহির হইতে চান না।

ছেলেবেলায় 'বৌ-বৌ' খেলিতে খেলিতে ছোট ছোট মেয়েদের যেমন সত্যিই বৌ হইবার সাধ জাগে এবং শেষে একদিন নিজেরও অলক্ষ্যে বৌ হইবার সমস্ত যোগ্যতাই অর্জ্জন করে, শশিশেখরও তেমনি 'ভগবান-ভগবান' খেলিতে খেলিতে সত্যই শেষে ভগবান হইল কিনা তাই বা কে বলিতে পারে?

কিন্তু না, ভগবান বোধহয় সে এখনও হয় নাই। তবে গত কয়েকদিন হইতে ক্রমাগত সে ভগবানের কথাই ভাবিতেছে। ভাবিতেছে—অদ্ভুত তাহার জীবনের কথা। এই যে মণিমালা—যাহার একটুখানি ভালবাসা পাইবার জন্য একদিন সে তাহার মনপ্রাণ এবং যথাসর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াও তাহা সে পায় নাই, ভালবাসার মিথ্যা অভিনয় দিয়া দু-দিনের জন্য ভুলাইয়া রাখিয়া শেষে তাহাকে নিদারুণভাবে অপমান করিতেও যে মণিমালা কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ সেই মণিমালাই তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব তাহারই পায়ে ঢালিয়া দিতে আসিয়াছে। শশিশেখর বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলে কি যে সে করিত, কে জানে। চিনিতে পারে নাই, ভালই হইয়াছে। আর তাহার চিনিয়াও কাজ নাই।

কিন্তু এ সান্ত্বনাটুকু ভগবান তাহাকে নাই-বা দিতেন!

অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়া স্নেহ-বঞ্চিত বুভুক্ষু হৃদয়ে সেই যে তাহার কি আগুন জ্বলিল, সে আগুন আজও নিবিল না। স্নেহের কাঙ্গাল অন্তর তাহার চাহিয়াছিল একটুখানি অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, একটুখানি ভালবাসা এবং তাহাই লইয়া ভাবিয়াছিল সে এই পৃথিবীর একপ্রান্তে কোথাও একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অনাবিল শান্তিতে জীবনযাপন করিবে। এ ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, সম্মান, ধন, সম্পদ—কিছুই সে চায় নাই। কিন্তু যাহা সে চায় নাই তাহাই সে পাইয়াছে অজস্র। অথচ অন্তর তাহার এখনও উপবাসী!

কোথায় শান্তি তাহার কোথায় সুখ? অর্থ তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই, কোনও দিনই পারিবে না তাহা সে জানে। এমন করিয়া কতদিন আর সে তাহার অভিশপ্ত জীবন বহন করিবে?—শশিশেখর ভাবিতেছিল, মানুষকে সে আর প্রবঞ্চনা করিবে না, বোধকরি সেইজন্যই সে নিজেও প্রবঞ্চিত হইয়াছে।

প্রবঞ্চনা করিতে সে চায় নাই। কে যে তাহাকে এ-কাজ করাইয়াছে কে জানে।

এখনও যদি সে এমন একটি নারীর সাক্ষাৎ পায়, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে যে তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়া অতৃপ্ত অশান্ত হৃদয়টিকে তাহার শান্ত করিতে পারে, তাহা হইলে জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া তাহাকে লইয়া সে বনবাসী হইতেও প্রস্তুত।

মণিমালাকে দোষ দেওয়া বৃথা। এত বুঝিয়াও সে যেমন নির্ব্বোধের মত এক গণিকার পায়ে হৃদয়মন ঢালিতে গিয়াছিল, তেমনি তাহার উপযুক্ত শাস্তিই সে পাইয়াছে। মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই মণিমালা তাহার রক্তের ঋণ পরিশোধ করিয়া, জানিয়া হোক্, না জানিয়া হোক্ আজ তাহারই কাছে অনুতাপ করিতে আসিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।

আহ্নিকের ঘরে পূজার আসনে বসিয়া দেওয়ালের বড় আর্শীটার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া শশিশেখর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে।—সময় বোধকরি আর নাই। জীবনের মধুময় বসন্ত সে তাহার বৃথাই অতিবাহিত করিয়াছে, আজ আর এই পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অনুতাপ করিয়া লাভ কি?

এইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা সেদিন তাহার অমলার কথা মনে পড়িল। সুদূর অতীতে সেই একটিমাত্র নারী উপযাচিকা হইয়া তাহার প্রেম নিবেদন করিতে আসিয়াছিল, ভুল বুঝিয়া তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহার জন্য অমলা তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল কিনা তাই-বা কে জানে এবং জীবনের প্রারম্ভে তাহার

সেই অভিশাপের জন্য আজ তাহার এই দুর্দ্দশা কিনা, তাই-বা কে বলিবে!

দিন কয়েক পরে, একদিন প্রভাতে ঠাকুরকে আর আশ্রমে দেখিতে পাওয়া গেল না। গত রাত্রে কোন্‌দিক দিয়া কেমন করিয়া যে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেহই জানিতে পারে নাই।

১৪

আজ এই এতকাল পরে সেই তাহাদের পুরানো শশিশেখর আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

সান্যাল-গৃহিণীর চোখের জল আর কিছুতেই থামিতে চায় না। আনন্দেরও সীমা নাই!

বছর তিনেকের ছোট একটি সাদা ফুটফুটে ছেলে সান্যাল-গৃহিণীর পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তিনি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'সর ভাই সর্, আজ আমার ছেলে এসেছে, তুমি যাও তোমার মা'র কাছে।'

ছেলেটি যে কাহার সেকথা শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিল না। জিজ্ঞাসা করিল না শুধু এই ভয়ে যে, তিনি হয়ত' বলিয়া বসিবেন—ছেলেটি অমলার।

অমলার তাহা হইলে বিবাহ হইয়াছে এবং শুধু বিবাহ নয়—ছেলেও হইয়াছে। শশিশেখর মনে-মনে ঈষৎ হাসিল। অমলার সঙ্গে তাহার বিবাহ একরকম স্থির হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এ-কথা সে ভাবিল কেমন করিয়া যে, হিন্দুর মেয়ে অমলা এখনও পর্য্যন্ত তাহারই অপেক্ষায় কুমারী অবস্থায় দিন কাটাইতেছে? আর তাহার জন্য যাইবার সময়ে কি আশ্বাসই বা সে দিয়া গিয়াছিল?

সন্ধ্যার সময়ে সান্যাল-মশাই দোকান হইতে বাড়ী ফিরিয়াই

শশিশেখরকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই গোঁফ দাড়ি থাকিলে ত' চিনিবার কোনও উপায়ই ছিল না!

মা বলিলেন, 'আ-মর! অমন হাঁ করে' চেয়ে রইলে যে? কেন, কাপড় চেনবার বেলা ত' ভুল হয় না! চিনতে পারছ না? শশিশেখর! ধন্যি দুষ্টু ছেলে বাবা! বলি হাঁরে শশি, যদি মরে যেতাম?'

'শশিশেখর! ওঃ! বাপ্ রে বাপ্!' বলিয়া সান্যালমশাই অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। মাথার চুলগুলা মাত্র জায়গায় জায়গায় পাকিয়া গেছে। অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আচ্ছা হাঁ বাবা শশি, অমন করে' কেন পালালি বাবা? কোথায় ছিলি এতদিন? বিয়ে-থা করেছিস?'

শশিশেখর বলিল, 'সে সব কথা পরে হবে। এখন কেমন আছেন বলুন?'

'আছি কোনোরকমে বেঁচে—এই মাত্তর্। গত বচ্ছর মা গেলেন।—আর তুমি যা কষ্ট দিলে বাবা সেকথা চিরদিন মনে থাকবে। তুমি না হয় পালিয়ে বাঁচলে, কিন্তু তোমার মা—ওই মাগী আমায় এই সেদিন পর্য্যন্ত তোমার জন্যে কম ভোগান্টা ভোগায় নি। লোকজন বাড়ীতে আমাদের আসবাব উপায় ছিল না বাবা। মাগী খালি ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ করে' কেঁদেছে আর বলেছে—আমার একটি ছেলে ছিল মা, পালিয়ে গেছে, নইলে সে থাকলে আজ আমার আর ভাবনা কি ছিল!......আর ওই জ্যোতিষী গণৎকার......! কম টাকাটা খেয়েছে ওর কাছে! সে বছর কালীঘাটে এক জ্যোতিষী বললে—ছেলে তোমার পশ্চিমের এক শহরে আছে। বাস্! সেই থেকে ঝোঁক ধরলে—চল পশ্চিমের শহরে যাব। আরে পশ্চিমের শহর ত' আর একটি দুটি নয়! তা কি আর শোনে! শেষে গেলাম

সবাই মিলে—পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহবাদ, মায় বৃন্দাবন পর্য্যন্ত। ও মাগী গেল বটে কিন্তু তিথি-পুণ্যি ওর কিছুই হলো না। ও খালি লোকজনের ভিড়েব মধ্যে একে-ওকে দেখলে আর আমায় শুধু ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। বলে,'একবার ছুটে গিয়ে ছাখো না গা, পুরুষ মানুষ একটুখানি ছুটলে কি পাড়টো তোমার ক্ষয়ে যাবে?—ওই ছাখো ঠিক শশিশেখরের মত।' কিন্তু কোথায় পাবে শশিশেখর! আমি শুধু ছুটে ছুটে হায়রাণ!'

'আবস্ত কবেছ ত' আমাব বদনাম করতে? ও-সব কিছু শুনিস্নি, বাবা শশিশেখর, তুই ত' জানিস বাবা—ও কাপুড়ে মিন্সেব সব মিছে কথা!' বলিতে বলিতে হাতে শশিশেখবেব জলখাবারের থালা এবং কোলে অমলার সেই ছেলেটিকে লইয়া একটা ঘব হইতে মা বাহিব হইয়া আসিলেন। কিন্তু অমলাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া হাতের থালা নামাইয়াই তিনি চীৎকার করিতে করিতে জল আনিতে গেলেন!— 'অমলা! বাল অ অমলা! গা ধুতে ধুতে আবাব কোথায় গিয়ে উঠ্লি মা? এদিকে দেখে যা কে এসেছে! শশিদা শশিদা করে' যে এদ্দিন...'

এমন সময় ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে অমলা আসিয়া দাঁড়াইল!

শশিশেখর মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল, এ যেন সে অমলা নয়, এ যেন আর কেউ! দেখিতে সে অনেকখানি বড় হইয়াছে! তখন ছিল কুমারী, এখন হইয়াছে সন্তানের জননী! তখন ছিল বাধাবন্ধহারা হরিণীর মত চকিত চঞ্চলা, এখন হইয়াছে ধীর-মন্থরা, লজ্জাবতী!

অমলা আগাইয়া আসিয়া হেঁট হইয়া শশিশেখরকে একটী প্রণাম করিল। অমলার সর্ব্বাঙ্গে কমনীয় যৌবন-শ্রী, কিন্তু মুখখানি তাহার বিষণ্ণ ম্লান!—তবে কি তাহার দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় নাই?

অমলা দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাল হলে?'

শশিশেখর কি যে জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার সেই বিষণ্ণ চোখদুটির পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

জলের গ্লাসটি শশিশেখরের হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া মা বলিলেন, এই মেয়েটাই কি কম কেঁদেছে তোমার জন্যে? নে বোস্ এইখানে, বসে' গল্প-সল্প কর্ বাছা। আর ওগো ওই! তুমি যে দোকান থেকে এসে ওইখানে বসে' বসে' দিব্যি আমার নিন্দে করতে আরম্ভ করলে, বলি, হাত-পা ধুয়ে আজ জল টল খাবে, না খাবে না? আমার নিন্দে করেই পেট ভরবে?'

সান্যাল-মশাই বলিলেন, 'থামো। আজ এতদিন পরে এলো শশিশেখর ....'

মা বলিলেন, 'বেশত' এলো—দু'দণ্ড থামতে দাও, জিরোতে দাও! আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি এখনও? এবার কিন্তু আর আমি পালাতে দেবো না বাছা, আমাদের পায়ে হাত দিয়ে তোমায় দিব্যি করতে হবে।'

আরও কি যেন তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কোল হইতে নামিবার জন্য অমলার ছেলেটা এমনভাবে হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, কথা তাঁহার আর শেষ হইল না; বলিলেন, 'নে মা নে, তোর এই দস্যি ছেলেকে কোলে করে' নিয়েই বোস্।'

অমলা তাঁহার কোল হইতে ছেলেটাকে একরকম কাড়িয়া লইয়াই সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, 'যাচ্ছিস্ যে?'

অমলা বলিল, 'আসছি।'

কিন্তু সে আর আসিল না।

সন্ধ্যার পরেই শশিশেখরের সঙ্গে অমলার আর-একবার দেখা হইল দেখা যে হইবে শশিশেখর সে আশা করে নাই। কোথাও কোনও নির্জ্জন পার্কে কিম্বা গড়ের মাঠে একাকী কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিবার জন্যই শশিশেখর বোধহয় বাহির হইতেছিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া সহসা নজর পড়িল, সিঁড়ির একপাশে রেলিংএর ধারে চুপ করিয়া অমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখের পানে তাকাইতেই শশিশেখর দেখিল, অমলা সজলচক্ষে একদৃষ্টে তাহারই দিকে তাকাইয়া। শশিশেখরই আগে কথা বলিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে-ধীরে ডাকিল, 'অমলা !'

অমলার চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। অস্পষ্ট-কণ্ঠে একবারমাত্র সাড়া দিয়াই সে মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

শশিশেখর বলিল, 'ভাল আছ অমলা ?'

তেমনি নতমুখে ঘাড় নাড়িয়াই অমলা বলিল, 'হ্যাঁ।'

য়াই সে একটুখানি থামিয়া কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভাল আছ ত ?'

কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভঙ্গীর চেয়ে কণ্ঠস্বরে যেন স্নেহের ভঙ্গীই বেশি !

'হাঁ' বলিয়া একবারমাত্র ঘাড নাড়িয়াই শশিশেখর দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কি আশা লইয়া যে এতদিন পরে শশিশেখর অমলার কাছে আসিয়াছিল কে জানে। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে ভাবিতে লাগিল, এ পৃথিবীতে সে একা—একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী প্রাণের দোসর তাহার কেহ নাই, জীবনের সঙ্গিনী নাই। বহু বিচি তাহার এই অদ্ভুত জীবনের সুখদুঃখের একজন দরদী অংশীদার না হইলে

'ম যেন আর চলে না। তাহারই সন্ধান সে তাহার সারা জীবন ধরিই করিছে, কিন্তু পায় নাই।

এখন শুই যেন তাহার মনে হইতেছে, মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হইবার ...তাঁর ইচ্ছায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত। প্রথম সূচনাতেই ...বনের আকাশ যাহার ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ...বয়সের আকাশে যে আর কোনোদিন সূর্য্যোদয় হইবে বলিয়া ত' ...ন হয়। বৃথাই মানুষের চেষ্টা, বৃথাই তাহার হা-হুতাশ!

এমনিব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে শশিশেখর পথ চলিতেছিল। ...রে রা তখনও বেশি হয় নাই। চারিদিকে অসংখ্য মানুষের ভিড়। ...কলেই আপন-আপন উদ্বেগ অশান্তি লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ...রবচ্ছি আনন্দ কোথায়? পৃথিবীতে বোধহয় এমন কেহই নাই—যে, তাহার মনে ঠিক যেমনটি চাহিয়াছে তেমনিটি পাইয়াছে।

সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই।

নিজ জীবনের আনন্দ যাহার অপরের উপর নির্ভর করে, সে ...ভাগ্য। নিজের আনন্দ নিজেরই অন্তর হইতে উৎসারিত না হইলে ...য় কোথাও তাহা পাইবার উপায় নাই—এটুকু আজ এতদিনের ...ভজ্ঞতা শশিশেখর স্থির জানিয়াছে। এবং তাহার জন্য চাই—পবিত্র ...র্মল মন; সে-জীবনে গ্লানি নাই, যেখানে অপকর্ম্ম নাই, অন্যায় নাই, ...র্ম্ম না এবং তাহার জন্য অনুশোচনাও নাই।

শশিশেখরের মনে হইতে লাগিল—বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত মনটিকে ...হাবান এক অদৃশ্য ব্যক্তি যেন আজ অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছে। ...হরকে চিনিতে গিয়া আজ যেন সে নিজেকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।

অর্থ জীবনে কম উপার্জ্জন করে নাই। কিন্তু অর্থে সুখ কোথায়?

সুখ অর্থে নাই, বাহিরে কোথাও নাই, সুখ মানুষের অন্তরের
নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

অন্তরের মধ্যে শশিশেখর আজ যেন একটি বিরাট শক্তির সঞ্চ
করিয়া কেমন যেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।
যাহা সে পায় নাই তাহার জন্য আজ আর সে বৃথা অনুশোচন
না! আজ হইতে মনে-মনে সে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার শক্তি
বুদ্ধি এবং অর্থ দিয়া অন্যকে সে সুখী করিবার চেষ্টা করিবে
হইতে যতদিন বাঁচিবে, জীবনে ইহাই যেন তাহার একমাত্র ব্রত

শেষ